দক্ষিণারঞ্জন বসু

বাক্-সাহিত্য

৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ—চৈত্র, ১৩৬৯

প্রকাশক :
স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্‌-সাহিত্য
৩৩ কলেজ রো
কলিকাতা—৯

মুদ্রক :
সুকুমার ভাণ্ডারী
রামকৃষ্ণ প্রেস
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট
কানাই পাল

মূল্য : তিন টাকা পঞ্চাশ ন. প.

সন্তোষকুমার ঘোষ

সোদরপ্রতিমেষু—

মূল কাহিনী এবং কাহিনীর
সমস্ত চরিত্রই সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

এই লেখকের কয়েকখানি বই

উপন্যাস

রোদ-জল-ঝড়

পরম্পরা

লাইলাক একটি ফুল

গল্পসংকলন

একটি পৃথিবী একটি হৃদয়

জীবন যৌবন

মন দেউলে দীপালোক

অনেক সুর

মধুরেণ

সুভদ্রার ভিটে

স্বপ্ন কোরক

কবিতা

আরও সূর্যের কাছে

ব্যঙ্গ রচনা

উলটো পুরাণ

ভ্রমণ

বিদেশ বিভুঁই

আলোচনা

শতাব্দীর সূর্য (রবীন্দ্রনাথ)

ছেড়ে আসা গ্রাম (দুই খণ্ড)

সংস্কৃতির ধর্ম (যন্ত্রস্থ)

কিশোর সাহিত্য

সাগর রাণীর দেশে

পেনাঙ-এর পাহাড়ে

বীরবাহাদুর

যত রাজ্যের রূপকথা (যন্ত্রস্থ)

কী কান্না, কী কান্না।

যেখানে সীতাকে হরণ করে নিয়ে যেতে পারে রাবণ, সেই পৃথিবীতে ধর্ম নেই সত্য নেই দয়ামায়া সরলতা কিছুই নেই।—সেদিন সারা পঞ্চবটী মুখর হয়ে উঠেছিল ক্ষুব্ধ কান্নায়। বনের সমস্ত পশু-পাখিই শুধু নয়, প্রতিটি বৃক্ষের উন্মত্ত আক্রোশ ছড়িয়ে পড়েছিল উন্মাদ বাতাসের সহযাত্রী হয়ে।

এ রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের কাহিনী।

কিন্তু সীতা হরণের অর্থাৎ মনোহরণের ঘটনা চিরন্তন।

শিয়ালদা সাউথ স্টেশন থেকে লোকাল ট্রেনে পোর্ট ক্যানিং। সেখান থেকে শৈবালদের নিয়ে মোটরবোট যখন গোসাবাঘাটে গিয়ে পৌঁছল সূর্যাস্তরাগে পশ্চিম দিগন্ত তখন রক্তাভ।

অঞ্জনার মুখখানিও কেমন যেন লাল লাল।

ও কী, তোমায় এ রকম দেখাচ্ছে কেন?

দেখাবে না, তুমি শুধু শুধু আমায় জোর করে গান গাওয়ালে! এত করে বললেম যে, গলাটা আমার আজ ভাল নেই, তবু শুনলে না। অমরেশবাবু কী ভাবলেন বল তো।—খুব আস্তে আস্তে শৈবালের প্রশ্নের উত্তর দেয় অঞ্জনা।

তার জন্যেই বুঝি লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছ এমনি! দেখো আবার সূর্যদেবের দেখাদেখি অস্তাচলে ডুব দিয়ে চোখের আড়াল হয়ে যেও না যেন।

আহা মরি আর কি! আমি চোখের আড়াল হলে তুমি একেবারে ধরাতল কেঁদে ভাসাবে বিরহী যক্ষের মতো!—কথায় অঞ্জনাও বড় কম যায় না।

অমরেশবাবু অঞ্জনার ছোট্ট মেয়ে শিখাকে নিয়ে অনেকখানি আগে আগে চলেছেন বলেই অতটা রসালাপ জমে উঠতে পেরেছে শৈবাল আর অঞ্জনার মধ্যে।

কিন্তু তবু কেন যেন বাধো বাধো ঠেকে। অমরেশ মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়েন বলেই হয়তো। শৈবাল তাই আর কথা বাড়ায় না।

নতুন হলেও কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্টের একজন কর্তা-ব্যক্তি বলেই শৈবালকে সস্ত্রীক আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছেন অমরেশবাবু। কাজেই তাঁর কাছে কোনো রকমেই যে ছোট হওয়া চলে না সে খেয়াল পুরো মাত্রায়ই আছে শৈবালের।

মাতলা আর বিদ্যা নদী পেরিয়ে আসতে আসতে নদীর নীল জলে ধোওয়া দুকুলব্যাপী সবুজ বনাঞ্চল দেখে মুগ্ধ হয়েছে অঞ্জনা।

তার আরো ভাল লেগেছিল বাসন্তীর হাট দেখতে গিয়ে। অমরেশবাবু তাদের সকলকে নিয়েই বাসন্তীর ঘাটে নেমেছিলেন গঞ্জ দেখাবার জন্যে। এর আগে অঞ্জনা কোনো দিন ধানকল দেখেনি। ধান ছাটাই, ধান মাড়াই ও ধান শুকোবার কেমন সব সুন্দর ব্যবস্থা! বড়ো বড়ো সব ধানের গোলাগুলো এক একটি লক্ষ্মীর মূর্তির মতো মনে হয়েছে অঞ্জনার। আবার লঞ্চে ফিরে এসে নদীপথে চলতে চলতে বিস্মিত হয়েছে এক একটি ছোট ছোট জেলে ডিঙিকে নির্ভয়ে তরঙ্গ-উন্মাদ বিশাল নদী পারাপার হতে দেখে। ক্যানিং পেরিয়ে আসবার পরেই লঞ্চ থেকে তীরবর্তী এক একটি গ্রাম দেখে মন নেচে উঠেছে অঞ্জনার। তার খুব ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেছে। পুব বাঙলার গাঁয়ের মেয়ে সে। ছোটবেলাটা তার নদীনালার দেশ পুব বাঙলার গাঁয়েই কেটেছে। কলকাতার জীবনে গঙ্গা ছাড়া অন্য নদী দেখবার সুযোগ এর আগে আর সে কোনো দিনই পায় নি। তা ছাড়া কলকাতার গঙ্গা আবার নদী! পদ্মা-তীরের মেয়ে অঞ্জনার এমনি মনে হত। আজই সে প্রথম দেখলে পশ্চিম বাঙলায়ও বড় নদী আছে।

মাতলা আর বিদ্যা যেখানে মিলেছে, লঞ্চে সে জায়গাটা পার হবার সময় অঞ্জনার মনে পড়ে গিয়েছে পদ্মা-মেঘনার মিলনস্থানের কথা। অনেকদিন আগে পিসীমার কাছে চাঁদপুর যাবার পথে স্টিমার থেকে পদ্মা-মেঘনার মিলিত রূপ দেখে আর প্রচণ্ড ঢেউ-এর মধ্যে পড়ে গিয়ে কী ভীষণ ভয়ই না সে পেয়েছিল সেবার! ঠিক ততটা না হলেও মাতলা-বিদ্যার সঙ্গম থেকে সুদূর-বিস্তারী জলরাশি ও তরঙ্গমালা দেখে তার গা ছমছম করে উঠেছিল। চোখের সামনে একটা খড়-বিচালীর বোটকে ঢেউ-এর ধাক্কায় ডুবে যেতে দেখে আতঙ্কে চোখ বুজিয়ে নিতে হয়েছিল অঞ্জনাকে। নৌকো-ডুবির অমনি ঘটনা মাঝে মাঝেই ঘটে থাকে, কী আর করা যাবে— তার জন্যে তো কাজকর্ম বন্ধ রাখা চলেনা, সারেঙের এই যুক্তি অঞ্জনাকে মেনে নিতে হলেও তার মনে হয়েছিল স্টিমার লঞ্চ নৌকো সব জলযানেরই নদীর পার ঘেঁষে ঘেঁষে চলাই ভাল। তাতে ভয় লাগে না। তীর ও তরঙ্গের খেলা দেখে চোখ জুড়োয়।

তেমনি ভাবেই অনেকটা পথ অতিক্রম করে এসেছে ওদের লঞ্চ। সবুজে আচ্ছাদিত এক একটি গ্রামের স্মৃতি অঞ্জনার চোখে যেন অঞ্জন লাগিয়ে রেখেছে সেই থেকে।

অমরেশবাবুরও ঠিক এমনি মনের অবস্থাই হয়েছিল তিনি প্রথমবার যখন সুন্দরবনে শিকারে গিয়েছিলেন তাঁর বাবার সঙ্গে। সে অনেকদিন আগের কথা। তখন তাঁর যৌবন বয়েস।

সেই প্রথমবারের নিজের জীবনের সুন্দরবন সফরের কাহিনী দিয়েই নদীর ভয়টাকে অঞ্জনার মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখবার চেষ্টা করে আসছেন অমরেশবাবু। তাঁর অতিথিরা নীরবে শুনে চলেছে তাঁর সেই গল্প।

যাই বলুন অঞ্জনা দেবী, পূব বাঙলার মেয়ে হয়ে আপনার কিন্তু বড়ো নদী দেখে ভয় পাওয়াটা মোটেই উচিত নয়। বরং নদীতীরের গ্রামগুলো দেখে আনন্দে মন ভরে ওঠারই কথা।

সে আর বলতে? অনেক দিন পর কলকাতার বাইরে এসে পল্লীর সবুজ সমারোহে সত্যি সত্যি চোখ জুড়িয়েছে। নদীর ভয় এতেই অনেকটা চাপা পড়েছে।—অমরেশবাবুর গল্প শুরু করার মুখে শুধু এই একটি উত্তর দেয় অঞ্জনা।

আমরা কলকাতার লোক না হলেও আমাদের ছোটবেলাটা কেটেছে একটা মহকুমা শহরে। খুলনা জেলার বাগেরহাটে আমাদের বাড়ি। ঐ ছোট্ট শহরেই পড়াশুনা করেছি। কলেজ ছেড়ে বেরুবার আগে পুরোপুরি গ্রাম-দেশ বড়ো একটা দেখিনি। বাবা আগে বাগেরহাটেই ওকালতি করতেন। শেষের দিকে কয়েক বছর মুন্সেফী করে সরকারী চাকরি থেকে যখন রিটায়ার করলেন আমিও তার পরের বছরই বি. এ. পাশ করে বেরুলাম। বাবার শিকারের বাতিক অনেক কালের। আর বছরে একবার অন্তত সুন্দরবনে শিকারে যাওয়া ছিল তাঁর একেবারে বাঁধাধরা নিয়ম। সুন্দরবনে আমি আগেও দু' একবার বাবার সঙ্গে যেতে চেয়েছি, কিন্তু কখনো তিনি আমাকে সঙ্গে নিতে রাজী হননি। ভয় পেয়েছেন। এতটুকু বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে সুন্দরবনে বাঘ শিকার করতে যাওয়া যায় না বলে প্রত্যেক বারই আমাকে হটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু বি. এ. পাশ করার পর একুশ বাইশ বছরের ছেলেকে তো আর বাচ্চা বলে দূরে সরিয়ে রাখা যায় না।

ও, তাই বুঝি সুযোগ বুঝে বি. এ পাশ করার পর নতুন করে আব্দার ধরলেন বাবার সঙ্গে সুন্দরবনে শিকার করতে যাবার জন্যে? —মাঝখানে টুক করে এই প্রশ্নটি তুলে বসে অঞ্জনা।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। সেবার বাবার সুন্দরবনে যাবার উদ্যোগ শুরু হতেই এমন বায়না আরম্ভ করে দিলাম যে বাবা আর সে যাত্রা আমাকে বারণ করার কোনো অজুহাতই খুঁজে পেলেন না। শেষপর্যন্ত অন্যান্য সবার সঙ্গে আমিও বাবার সঙ্গী হলাম তাঁর শিকার অভিযানে।

বাঃ!—শিকারী মানুষ শৈবাল শিকারের কথায় হঠাৎ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেই আবার চুপ।

বাগেরহাট থেকে আমরা সদলে ট্রেনে করে এসে পৌঁছুলাম খুলনা শহরে। সেখানে একরাত কাটিয়ে পরদিন সকালে রূপসা নদীতে লঞ্চ ধরে শিবসা ও পসর নদী হয়ে চালনায় এসে আবার বিশ্রাম। চালনায় নতুন বন্দর হবে, কথা উঠেছে সেই সময় থেকেই। বন্দর হবার সত্যি যোগ্য জায়গা এই চালনা। আপনারা নিশ্চয় জানেন দেশ ভাগ হবার পর আমাদের সময়ের চালনা গঞ্জ এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে পূর্ব পাকিস্থানের একটি সেরা বন্দর।

ওসব বন্দরের কাহিনী এখন জানতে চাইনা, আপনাদের শিকার অভিযানের কথা বলুন।—শৈবালের অস্থিরতা প্রকাশ পায় তার এই তাগিদের মধ্যে।

হ্যাঁ, এবার তাই বলছি। আরেকটা রাতও কেটে গেল চালনায়, পরদিন নতুন একটা সুন্দর লঞ্চে চেপে আমরা পসর নদী ধরেই ভাটির দিকে এগিয়ে চল্লাম। চলতে চলতে নদীর দু' পাশের দু' চারটি গ্রামের দৃশ্য আমার মনকে একবারে যেন জুড়িয়ে দিলে। এতকাল ধরে তো গ্রামেই জীবন কাটাচ্ছি, কিন্তু এখনো মাঝে মাঝে সেই পুরোনো দৃশ্য আমার মনের আয়নায় ভেসে ওঠে।

নদীর পারের এই গ্রামগুলো দেখে আমারও সত্যি সত্যি খুব ভাল লাগছে। আর এই নদীগুলোর নামও ভারি সুন্দর।—মাঝখানে আর একটি মন্তব্য করে অঞ্জনাদেবী শিখার পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে। নদীর হাওয়ায় গল্প শুনতে শুনতে শিখার দু' চোখ জুড়ে ঘুম এসেছে।

যা বলেছেন, সত্যি সত্যি আমাদের দেশের প্রায় সব নদীরই ভারি মিষ্টি নাম। বিশেষ করে সুন্দরবন অঞ্চলের এক একটি নদীর নাম একেবারে মনে গেথে রাখার মতো। এই ধরুন, মালঞ্চ —কী অপূর্ব নাম বলুন তো! আরো আছে—রায়মঙ্গল, হরিণঘাটা এমনি আরো সব সুন্দর সুন্দর নামের অনেক নদী। তবে এ নদীগুলো সব গিয়ে পড়েছে পাকিস্তানী সুন্দরবনে। তা' হোক, আমাদের বিদ্যা, মাতলার নামই বা কম যায় কিসে?

এ কি হচ্ছে অমরেশবাবু, আপনার আলোচনার ট্রেন যে ডিরেলড হয়ে গেল দেখছি !—শৈবালের বাধায় থমকে যেতে হয় বক্তাকে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন আপনি। আলোচনার গতিটা একটু অন্য লাইনেই চলে যাচ্ছিল। এবার সোজাসুজি আমাদের সেবারের শিকারের গল্পটাই বলছি, শুনুন।—এই বলে অমরেশবাবু তাঁর জীবনে প্রথম দেখা সুন্দরবনের শিকার সম্বন্ধে একটি বর্ণনা দিয়ে চললেন।

রাত থাকতে থাকতেই আমাদের লঞ্চ চালনা গঞ্জ ছেড়ে সুন্দরবনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। বাবা পুরোপুরি শিকারীর পোষাক পরে নিয়েছিলেন এবং তাঁর হাতে ছিল একটা ম্যাগনাম রাইফেল। শুধু একটা রাইফেলের ওপর পুরো ভরসা করা যায় না বলে একটা সিঙ্গল ট্রিগারের বন্দুকও নিয়ে নেওয়া হয়েছিল আমাদের সঙ্গে। বন্দুকটা ছিল বাবার বুড়ো পিওন জগদীশের ছেলে ভোলার হাতে। ভোলা যেমনি সাহসী, তেমনি তাগড়াই ওর চেহারা। বাবা তাই ওকেই তাঁর সহকারী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। বাবার সঙ্গে সঙ্গে কিংবা তার দু'চার মাস আগেই হয়তো জগদীশের সরকারী চাকরি শেষ হয়ে যায়। কিন্তু সে বাবাকে ছাড়তে চায় না। বাবা তাই রিটায়ার করার পর জগদীশকে নিয়ে বাড়ি ফেরেন এবং জগদীশের ছেলে ভোলাও আসে সেই সঙ্গে। সেই থেকেই ভোলা শিকার-অভিযানে বাবার সহকারী। তবে সেবারের সুন্দরবন যাত্রায় শুধু ভোলা নয়, ভোলার বাবাকেও নেওয়া হয়েছিল সঙ্গে আমাকে সামলানোর জন্যে। জগদীশের ওপর বাবার কড়া হুকুম ছিল আমি যেন কখনো তার হাতছাড়া না হই। সত্যি সত্যি জগদীশ আমার ওপর সর্বক্ষণ খুব কড়া নজর রেখেছিল। এক মুহূর্তের জন্যেও আমি তার দৃষ্টির বাইরে যেতে পারিনি।

সে তো খুবই ভালো, সব বুঝলাম। কিন্তু শিকার কোথায়? —আসল কথাটা জানবার জন্যেই শৈবালের বেশি আগ্রহ, বিবরণের

জন্যে তত নয়। তাই শিকারের সাফল্য বা অসাফল্যের কথাটাই সে বলতে বলে অমরেশবাবুকে।

সেইটাইতো আসল ব্যাপার। চালনাগঞ্জে লঞ্চে উঠেই বাবা বলেছিলেন, আগের বছর সুন্দরবনে কোনো শিকারই মেলেনি, কিন্তু এবার আর খালি হাতে ফেরা চলবে না।

সেই প্রতিজ্ঞা রাখতে পেরেছিলেন তো আপনার বাবা ?

শুধু রাখা নয় ষোলো আনার ওপর আঠারো আনা জেদ পূরণ করে তবে বাবা সুন্দরবন থেকে বাড়ি ফিরেছিলেন।—খুব মেজাজের সঙ্গে এবার শ্রীমতী অঞ্জনার প্রশ্নের জবাব দেন অমরেশবাবু।

সে আবার কী ব্যাপার ?—শৈবাল জিজ্ঞেস করে।

তাই বলছি, শুনুন। আমার তো মনে হয় খুবই ইনটারেস্টিং লাগবে আপনাদের কাছে।—এই বলে অমরেশবাবু আবার শুরু করেন তাঁর প্রথম শিকার অভিযান কাহিনীর বাকি অংশ বলতে।

ভোর হয়ে গেলে চোখে পড়ল, আমাদের লঞ্চটা একটা দ্বীপের কাছে এসে থেমেছে। বাবা সেখানেই ভোলাকে আর তিন চারজন মাঝিকে নিয়ে সঙ্গের নৌকোটা লঞ্চ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাতে গিয়ে চেপে বসলেন। আমাকে লঞ্চেই রেখে গেলেন জগদীশের কড়া পাহারায়। জগদীশের হাত ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আমি দূর থেকে দেখলাম, সেই নৌকোটা একটু ঘুরে গিয়েই আরেকটা ছোট্ট দ্বীপের পারে গিয়ে নোঙর ফেল্লে। ওদের সঙ্গে যেতে না পেরে মনটা আমার তখন ভারি খারাপ। মনে মনে বাবার ওপর ভীষণ রাগ। সেই দুঃখ সেই রাগই মাঝে মাঝে প্রকাশ হয়ে পড়ছিল জগদীশের সঙ্গে আমার এক একটা কথায়। কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম, জগদীশ তখন ভাবছিল অন্য কথা। আমার কোনো কথারই জবাব দিতে পারছিল না। অনেক পরে সে বিষয়টা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। আমার জন্যে আমার

বাবার যেমন দুশ্চিন্তা, ভোলার জন্যেও তো ঠিক তেমনি দুশ্চিন্তাই ছিল জগদীশের। তাই সে ভোলাকে ছেড়ে দিয়ে আমার হাত ধরে লঞ্চের রেলিং-এর ওপর ভর দিয়ে মুখ কালো করে দাঁড়িয়েছিল।

তারপর?—গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস করল শৈবাল। বেশ বোঝা গেল গল্প ঠিক জমে উঠেছে।

নৌকো থেকে নেমে অদূরের ছোট্ট দ্বীপটার কোথায় যেন বাবা তার দলবল নিয়ে হারিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই অদৃশ্য। হবে না? কী বিরাট বিরাট সব গাছ। আর কেবল ঝোপ আর ঝোপ। দূর থেকে মনে হয় যেন ঘন কালো অরণ্য, সূর্যকেও যেন অনেক কষ্টে সেখানে প্রবেশ পথ বার করে নিতে হয়। পরে জেনেছিলাম যে ঐ ছোট্ট ছোট্ট ঝোপগুলো আসলে গাছের ঝোপ নয়, বড়ো বড়ো সব গাছের শেকড় মাত্র। বন্যার সময় অক্সিজেন নেবার জন্যে নাকি ওগুলো অমন লম্বা হয়ে ওঠে। সে যাই হোক, প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। হঠাৎ একটা গুলীর আওয়াজে আমরা দু'জনেই চমকে উঠলাম—আমি এবং জগদীশ। একটা আওয়াজের পর আর কোনো সাড়াশব্দ না পাওয়ায় আমরা ধরেই নিলাম, আর যাই হোক এ বাঘ শিকারের ব্যাপার নয়। বাঘ হলে পরপর নিশ্চয়ই কয়েক বার গুলী ছুঁড়তে হতো। তা ছাড়া ঐ আওয়াজটা ছিল ভোলার হাতের ট্রিগার বন্দুকের শব্দ, বাবার রাইফেলের নয়। বাঘ দেখলে কি আর বাবা রাইফেল না চালিয়ে পারতেন! কিছুতেই নয়।

সে অনুমান আপনাদের ঠিক হয়েছিল?—জানতে চায় শৈবাল।

হ্যাঁ, আমরা যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। দূর থেকে একদল হরিণকে ছুটতে দেখে ভোলা নাকি আনন্দে এমনি আত্মহারা হয়ে পড়েছিল যে সে আর মুহূর্তও দেরি না করে তৎক্ষণাৎ বন্দুক ছুঁড়ে বসে। আর সঙ্গে সঙ্গেই ছুটছাট এদিক ওদিক পালিয়ে যায় হরিণের দল, শুধু একটি বাদে। সেই একটি হরিণই গুলীবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে যায়।

ঐ হরিণ শিকার করেই ফিরে এলেন, না আরো বড়ো কোনো শিকার করা সম্ভব হয়েছিল সেবার ?—এ প্রশ্নও শৈবালই জিজ্ঞেস করে।

না না, আরো অনেক ব্যাপার ঘটেছে তারপরে। ভোলা ঐ গুলী-বেঁধা হরিণটাকে কাঁধে নিয়ে অন্য আর সবার সঙ্গে বাবার পিছে পিছে এগোয়। চলতে চলতে পছন্দমতো একটা গাছ চোখে পড়তেই বাবা থামেন সেখানে এবং তাঁর কথা মতোই ভোলা ঐ গাছতলায় আধমরা হরিণটাকে তার কাঁধ থেকে নামিয়ে রাখে বাঘের টোপ হিসেবে। বড়ো রকমের একটা শিকার না নিয়ে বাড়ি ফিরবেন না এই সঙ্কল্প করেই বাবা সে-যাত্রা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। কাজেই বাঘ শিকারের পাকা ব্যবস্থা করেই তার জন্যে পুরোপুরি তৈরি হয়ে নিলেন। গাছের তলায় টোপ ফেলে রেখে ভোলা ওরা সবাই আশপাশের এক একটা গাছের ওপরে গিয়ে উঠে বসল। আসল গাছটার ওপরে গিয়ে বসলেন বাবা নিজে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে এতগুলো লোকের দৃষ্টি সেই গহন অরণ্যের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল, কিন্তু শিকারের সন্ধান না পেয়ে সবাই অস্থির। সন্ধ্যা হয় হয় এমনি সময়ে কেমন যেন একটা চাঞ্চল্য প্রকাশ পেলো গোটা দ্বীপ জুড়ে। গাছে গাছে সব বানরগুলো একই সঙ্গে এমনি জোরে চেঁচামেচি শুরু করে দিলে যে সেই চেঁচামেচি শুনে আমরাও খুব ভড়কে গেলাম। কী জানি জঙ্গলের মধ্যে কেউ যদি আবার বিপদে পড়ে থাকে, সেই ভয়। তেমন কিছুই হয়নি। তবে সুন্দরবনের বানরেরা হরিণদের নাকি পরম বন্ধু। কোনো রকম বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই হরিণদের সাবধান করে দেবার জন্যে বানরগুলো দলবেঁধে অমনি নাকি চিৎকার শুরু করে। সেদিনও তেমনি ঘটনাই ঘটেছিল।

তাই বুঝি! হঠাৎ কোনো বাঘ এসে কোনো হরিণী বা হরিণ-শিশুকে গ্রাস করে ফেলে বোধ হয়।—এতক্ষণ দম বন্ধ করে

অমরেশের সমস্ত কথা গোগ্রাসে গিলতে থাকলেও আর চুপ করে থাকা সম্ভব হয় না অঞ্জনার পক্ষে। হঠাৎ সে চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং একটা অনুমানকে ভিত্তি করে এই প্রশ্ন তুলে বসে।

না, ঠিক তা নয়।—অঞ্জনার সেই অনুমানকে বাতিল করে দিয়ে কাহিনীর পরবর্তী অংশটুকু আবার বলতে থাকেন অমরেশবাবু।

অন্ধকার নেমে আসছে। এমনি সময় বাবার চোখে পড়ল, একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার হরিণ শিকারের লোভেই এগিয়ে চলেছে। টোপের দিকে আকৃষ্ট হলেই গুলী ছোড়া হবে বাবা তেমনভাবেই বন্দুকের তাক কষছিলেন। কিন্তু বাঘটা ভারি চালাক। ঐ টোপের দিকে না এগিয়ে কোথায় যে সে মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল তার কোনো হদিশই করে উঠতে পারলেন না বাবা। এর পরে আর সুন্দরবনের জঙ্গলে থাকা চলেনা। তাই ঐ মৃতপ্রায় হরিণটাকে নিয়েই যখন ফিরে আসার উদ্যোগ হলো সহসা পথ চলতে চলতে ভোলার শস্ শব্দে সবাই থমকে দাঁড়াল। হ্যাঁ, ভোলা ঠিকই দেখেছে, একটা ডোরাকাটা বাঘ খালের দিকে এগুচ্ছে জল খাবার জন্যে। একই সঙ্গে সবার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল বাঘটার দিকে। ভোলা ততক্ষণে বন্দুক তুলে তাক করে নিয়েছে, ট্রিগার টিপে দিয়েছে এক নিশ্চিত সুযোগ বুঝে।

নিশ্চিত সুযোগ বলছেন, তা'হলে নিশ্চয়ই মারা পড়েছিল বাঘটা!—জানবার জন্যে অদ্ভুত রকমের একটা আগ্রহ প্রকাশ পায় শৈবালের এই কথায় এবং তার এই কথা বলার সুর ও ভঙ্গিতে।

না, আসলে বাঘটা মারা পড়েনি। মরতে মরতে ভোলা বেচারা কোনো রকমে বেঁচে গিয়েছে।

কী সর্বনাশ! আচ্ছা বলতে পারেন অমরেশবাবু, কী দরকার নিজেদের জীবন বিপন্ন করে এমনিভাবে বাঘ-ভালুক শিকার করে বেড়ানোর?—চমকে উঠে অমরেশবাবুকে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করে অঞ্জনা।

একি বলছেন আপনি অঞ্জনা দেবী! জীবনে নানারকম বৈচিত্র্য আছে বলেই তো জীবন এত সুন্দর, এত আকর্ষণীয়। যাক সে সব, আগে শুনুন কী করে মরতে মরতে ভোলা বেচারা বেঁচে গেল।

বলুন, সেটাইতো শোনবার।—এবার বেশ জোরালো কণ্ঠেই তাগিদ দেয় শৈবাল।

হ্যাঁ, বন্দুকের শব্দে ঝাঁক ঝাঁক সব পাখি ভয় পেয়ে উড়তে শুরু করে দিলে। আর আশপাশের জীবজন্তুগুলোও ছুটোছুটি করে এদিক ওদিক পালাতে লাগল। গুলী খেয়ে বাঘটাকে পড়ে যেতে দেখেই সবাই আনন্দে অধীর। ভোলার আনন্দের সীমা নেই। বন্দুকটাকে আরেকজন সঙ্গীর হাতে তুলে দিয়ে সে একটা তীক্ষ্ণ ছোরা নিয়ে ছুটে গেল পড়ে যাওয়া বাঘটার দিকে। ওর পিছে পিছেই এগুতে থাকল আর সবাই। বাবা গেলেন সবার শেষে। কিন্তু সকলের দৃষ্টিসীমার মধ্যেই মুহূর্তের মধ্যে একটা অঘটন ঘটে বসল। চোখ বুজে মরার মতো পড়েছিল বাঘটা। কাছে যেতেই প্রচণ্ড গর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভোলার ওপর। সকলের চিৎকারে এবং বন্দুক লাঠি ছোরা দেখেও ভয় পেল না, বাঘটা এমনি হিংস্র। ভোলার আত্মরক্ষার কোনো উপায় নেই দেখে বাবা অনেকখানি বিপদের ঝুঁকি নিয়েই ক্রোধান্ধ উন্মত্ত বাঘটাকে লক্ষ্য করে পরপর কয়েকটা গুলী ছুঁড়লেন। দু'টো গুলী এমনভাবে তাকে বিদ্ধ করল যে ক্ষত-বিক্ষত ভোলার পাশেই বাঘটার নিষ্প্রাণ দেহ অসাড় হয়ে পড়ে গেল। তারপরেও ঐ মরা বাঘটার ওপরেই আরো দু' তিন বার গুলী চালিয়ে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। বাবা সদলবলে ঐ মরা বাঘটা আর আধমরা ভোলাকে নিয়ে লঞ্চে ফিরে এলেন। বাবা একটা বাঘ শিকার করে নিয়ে এসেছেন দেখে জগদীশ যে কী আন্দাজ খুশী হয়েছিল তা আর কি বলব। কিন্তু যেই মুহূর্তে সে দেখতে পেল ভোলাকে ধরাধরি করে নিয়ে আসা

হচ্ছে জগদীশের সে কি কান্না, কি হা-হুতাশ! বাস্তবিকই ভোলার ঐ অবস্থার জন্যে বাঘ শিকারের আনন্দ আমরা কেউ-ই সেবার উপভোগ করতে পারিনি। তবে অনেকক্ষণ ধরে সেবা-শুশ্রূষার পর লঞ্চেই ভোলার জ্ঞান ফিরে এসেছিল এবং বাবা যে জগদীশকে শান্ত করবার জন্যে বারবার ভোলার জীবন সম্বন্ধে আশ্বাস দিচ্ছিলেন সে আশ্বাস শেষ পর্যন্ত সত্য হওয়ায় আমরা একটা বিরাট দায় থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিলাম। 'আমার সঙ্গে শিকারে গিয়ে জগদীশের ছেলের প্রাণটা গেলে কি কলঙ্ক কি অশেষ পাপেরই না ভাগী হতে হতো আমাকে! ভগবান আমাকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। অসীম করুণাময় ঈশ্বর।' যতদিন বেঁচেছিলেন বাবা প্রায়ই এ কথা বলতেন এবং সেবারের পর আর কখনো তিনি সুন্দরবনে শিকারে বেরোননি।

তাই বুঝি!

হ্যাঁ, ভাই!—শৈবালের কথার উত্তরে অমরেশবাবু আবার তাঁর কাহিনীর সুতো টানতে আরম্ভ করে দেন। বলেন, জানেন শৈবালবাবু, বাঘ শিকার করতে যেয়ে ভোলা বাঘের কবলে পড়ে ক্ষতবিক্ষত হওয়ায় বাবা অসম্ভব রকম বিচলিত হয়ে পড়লেও ফেরবার পথে এমন এক শিকার তিনি করে বসলেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যার জন্যে তাঁর গৌরবের অন্ত ছিল না।

কী এমন শিকার, বলুন তো!—অঞ্জনার জিজ্ঞাসায় কেমন যেন সংশয়ের সুর।

যে সন্দেহ আপনাকে এ বিষয়ে এত কৌতূহলী করে তুলেছে তা অমূলক নয় অঞ্জনা দেবী। তাই পুরো ঘটনাটাই আপনাদের খুলে বলছি। নিহত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার মহাশয় এবং আহত শ্রীমান ভোলাকে নিয়ে আমরা যখন লঞ্চে চড়ে ফিরতি যাত্রা শুরু করেছি ভোলার জন্যে বাবা তখন চিন্তায় ভাবনায় একেবারেই ভেঙে পড়েছেন। ওদিকে বুড়ো জগদীশও কেঁদে কেটে অস্থির।

মাঝে মাঝে ভোলার একটু আধটু জ্ঞান ফিরে আসছে, আবার হঠাৎ হঠাৎ সে অজ্ঞান হয়ে পড়ছে। চোখের সামনে এমনি অবস্থায় মাথা কি আর কারুরই ঠিক থাকে? কতক্ষণ ধরে ছটফট করতে করতে বাবা লঞ্চের ভেতর থেকে এসে একটু বাইরে দাঁড়ালেন। ভোলাকে বাঁচানোর চিন্তা ছাড়া আর কোনো চিন্তাই নেই তখন তাঁর মনে। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি তখন ভগবানকে একমনে ডেকে চলেছেন। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল, আরেকখানি লঞ্চ দূর থেকে খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে। দেখতে দেখতে একেবারে আমাদের লঞ্চের কাছাকাছিই এসে পড়ল সেই লঞ্চটা আর বাবা চিৎকার করে উঠলেন, 'শুনুন, শুনুন, আপনাদের লঞ্চটা একটু থামান—আমরা বিপন্ন।' সাধারণত দস্যু ডাকাতের ভয়ে সুন্দরবনের নদীতে কেউ বড়ো একটা থামে না এমনি ডাক শুনে। তবে বাবার ডাকে এমনই একটা কাতরতা ছিল যে ঐ লঞ্চটি আর না থেমে পারেনি। বাবার চিৎকারে আমরাও দু' তিনজন ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। দেখলাম, একটি তরুণী বাইরে দাঁড়িয়ে লঞ্চের হাতলে ভর দিয়ে নদীর বুকে জ্যোৎস্না রাতের সৌন্দর্য দেখছে। কিন্তু আমাদের বেরিয়ে আসতে দেখেই মেয়েটি ভিতরে চলে গেল এবং বাইরে এলেন তার বাবা মা ও আরেক ভদ্রলোক। আমাদের কি বিপদ ঘটেছে জানতে চাইলেন মেয়েটির বাবা। আমার বাবা সংক্ষেপে সব কথাই তাঁকে খুলে বল্লেন। সত্যি কি বলব, একেবারে আশ্চর্য যোগাযোগ! এমনি বিপদের সময় এমন একজন নামকরা ডাক্তারের সন্ধান পাওয়া বাস্তবিকই খুব আশ্চর্যের ব্যাপার নয় কি?

নিশ্চয়। কিন্তু সেই নামকরা ডাক্তারটি কে বলুন তো!—অমরেশবাবুর প্রশ্নের জবাব দিয়ে নিজেও একটি প্রশ্ন তোলে শৈবাল।

হ্যাঁ, ঐ মেয়েটির বাবার নাম ডাঃ সর্বেশ্বর হালদার। আমার বাবার মুখে ভোলার শোচনীয় অবস্থার কথা শুনে ডাঃ হালদার তাঁর ব্যাগটা নিয়ে এক লাফে চলে এলেন তাঁদের লঞ্চ থেকে

আমাদের লঞ্চে। ভোলাকে তিনি পাউডার জাতীয় কি একটা ওষুধ খাইয়ে দিলেন এবং একটু পরে একটা ইনজেকশনও দিলেন। দু'টো লঞ্চই পাশাপাশি এক সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু এতক্ষণ ধরে অন্য লঞ্চের ভেতরের আবহাওয়াটা দুশ্চিন্তায় তুষারস্তব্ধ। জানা নেই শুনা নেই কে কোথা থেকে একটা হাঁক দিলে আর কর্তা এমনি লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে সেখানে চলে গেলেন, কী .বিপদের কথা! সাংঘাতিক রকমের একটা কিছু ঘটনা যদি ঘটে বসে তা'হলে কী উপায় হবে, এমনি ধরনের ভাবনাতেই উতলা হয়ে দেওর পরমেশ্বরকে বকেঝকে আমাদের লঞ্চে পাঠিয়ে দিয়ে হালদার-গিন্নীর একটু সোয়াস্তি। একটু বাদেই ভোলা বেশ ভালো মতোই জ্ঞান ফিরে পায়, টুকরো টুকরো দু'চারটে কথা বলতেও শুরু করে। সেই দেখে আমাদের লঞ্চে যে তখন কী আনন্দ তা আর কি বলব। ডাঃ হালদারও তখন নিশ্চিন্ত হয়ে বাবাকে বললেন, আর ভয় পাবার কোনো কারণ নেই—চলুন এবার আমাদের লঞ্চে, আমার ছোট ভাই পরমের সঙ্গে তো দেখাই হয়ে গেল, আমার স্ত্রী এবং কন্যার সঙ্গেও আলাপ হবে'খন, ওঁরা খুব খুশী হবেন। এই বলে ডাক্তারবাবু আর তাঁর ভাই বাবাকে নিয়ে তাঁদের লঞ্চে চলে যান।

তারপরে কি দাঁড়াল?—ইণ্টারেস্টিং কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে এমন অনুমান করে নিয়েই জিজ্ঞেস করে অঞ্জনা।

তারপরে যা দাঁড়িয়েছিল সে অনেক দীর্ঘ কাহিনী।

হোক না দীর্ঘ, আপনি সবটাই বলুন। শুনতে বেশ লাগছে।— অনুমান যে তার মিথ্যে নয় অমরেশবাবুর বলার ভঙ্গি থেকেই অঞ্জনা তা ঠিক ধরে ফেলে। এবং তা ঠিক ঠিক ধরতে পেরেই সে পুরো গল্পটা শোনবার জন্যে ইচ্ছে প্রকাশ করে।

মাপ করবেন অঞ্জনা দেবী, সে কাহিনী বিস্তারিতভাবে বলার আর সময় নেই। ঐ তো গোসাবা ঘাটে আমরা এসে গেলাম প্রায়।

হ্যাঁ, ওদিকটায় দু'চারজনকে দেখা যাচ্ছে বটে। বেশ, আপনার জীবনের প্রথম শিকার অভিজ্ঞতার শেষ অধ্যায়টুকু সংক্ষেপেই আমাদের বলুন তা'হলে।—পথের শেষ হয়ে এসেছে, গল্পের সারাংশ শুনেই এখন খুশী হতে চায় শৈবাল।

তবে তাই শুনুন।—এই বলে খুবই অল্পের মধ্যে গল্পের উপসংহার টানতে উদ্যোগী হন অমরেশবাবু।

জানেন, ডাঃ হালদারদের লঞ্চে গিয়ে বাবা এমনি কথায় মজে গিয়েছিলেন যে এক সময় আমরা বলাবলি আরম্ভ করেছিলাম যে, তিনি বোধহয় আমাদের কথা ভুলেই গিয়েছেন। কিন্তু আসলে তা' নয়। আমাদের মনে ঐ রকম ভাবনা দেখা দেবার পরক্ষণেই বাবা আমাদের লঞ্চে ফিরে এসে একটা হৈ-চৈ কাণ্ডই যেন বাধিয়ে দিলেন।

সে আবার কি ?—শৈবালের জিজ্ঞাসায় বিস্ময়।

আর বলবেন না শৈবালবাবু! বাবা আমাদের লঞ্চে ঝাঁপিয়ে পড়েই জগদীশকে ডেকে বললেন, 'ভোলা ভালো হয়ে গেছে, আমরা নিশ্চিন্ত। কিন্তু জানিস জগদীশ, দুঃখের পরেই আনন্দ। একেবারে নির্ঝঞ্ঝাটে আমার জীবনের সেরা শিকার করে এলাম।' বাবার এ কথায় আমরা তো সবাই অবাক। কিন্তু বাবা একেবারে আনন্দউচ্ছল। তিনি এক রকম চিৎকার করেই বললেন, কাল সকালেই তোমরা দেখতে পাবে কী চমৎকার শিকার এবার আমি করেছি।—বলতে বলতে চোয়াল দু'টো ফুলে ফুলে ওঠে অমরেশবাবুর।

আমি কিন্তু আগে থেকেই সবটা বুঝতে পেরেছি।

বলুন তো কি ?—হাসতে হাসতে অঞ্জনাকে জিজ্ঞেস করেন অমরেশ।

ডাঃ হালদারের মেয়েটিকে দেখে আপনার বাবা আর লোভ সামলাতে পারেন নি। মনে মনে ওকে ছেলের বৌ করে নিয়েছেন, এই তো!

অঞ্জনার কথা শুনে হো হো করে হেসে ওঠেন অমরেশবাবু এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে শৈবালও না হেসে পারে না।

কিন্তু আপনি কি করে এমন অনুমান করতে পারলেন বলুন তো।—অমরেশবাবু হাসি থামিয়ে জিজ্ঞেস করেন অঞ্জনাকে।

নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই এমনি অনুমান করতে শিখেছি। আমার শ্বশুর মশাইও তাই করেছিলেন কিনা তাই।

উঃ খুব কথা বলতে শিখেছ দেখছি। তা হলেও এখন আর নিজের দামটা অমন করে বাড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করে লাভ কি অঞ্জনা!—রহস্যছলেই এই বলে একটু চিমটি কাটে শৈবাল।

ও, আমি বাড়িয়ে বলছি বুঝি!

বারে, আপনারা নিজেদের মধ্যে এমনি ভাবে তর্ক জুড়ে দিলে আর আমার কথা শোনা হবে কি করে?—অমরেশবাবু মাঝখানে পড়ে বিতর্ক মিটিয়ে দেন শৈবাল ও অঞ্জনার।

না না, আমাদের এই ইনটারাপশনের জন্যে সত্যি আমরা খুব দুঃখিত। আপনার শেষ কথাই এবার আপনি বলে ফেলুন।—অনেকটা মার্জনা ভিক্ষার সুরেই শৈবাল দুঃখ প্রকাশ করে।

আমারও আর তেমন কিছু বলার নেই। আর শেষ কথাটা তো অঞ্জনা দেবীই বলে দিয়েছেন। তবে বলবার কথা এখনো যেটুকু বাকি তা হলো এই, মধ্য রাত পার করে দিয়ে চালনা গঞ্জে পৌঁছে বাকি রাতটুকু আমরা লঞ্চে কাটিয়ে দিলেও পরদিন ডাঃ হালদারের বাড়িতে আমাদের নিয়ে যে উৎসবের ধূম পড়ে গিয়েছিল তা আমি কোনো দিন ভুলব না।

সে কি কথা, কী করে ভুলবেন? হালদার-কন্যা আপনাকে ভুলতে দিলে তো!

যা বলেছেন অঞ্জনা দেবী! আর বাস্তবিকই সেদিনই চালনায় ডাঃ হালদারের বাড়িতে বসে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমার মুক্ত জীবনে বন্ধন দশা আসন্ন।

কিন্তু যাই বলুন না কেন অমরেশবাবু, এই বন্ধনের মধ্যেই কি মানুষ চিরকাল প্রকৃত মুক্তির আনন্দকে যথার্থ ভাবে আস্বাদন করে আসছে না !—অঞ্জনার এই মুখের কথা শেষ হতে না হতেই গোসাবা ঘাটে এসে লঞ্চ লাগে।

শৈবাল তার আদরের মেয়েকে ডেকে ঘুম ভাঙায়। একটা হাই তুলে শিখা উঠে বসে।

॥ দুই ॥

মোটর লঞ্চ থেকে নেমেও দীর্ঘ পথ ধরে সবুজ গাছের মিছিল। মধ্য গাঙের ভয় কাটিয়ে তীরে এসে একটা পরম মুক্তির নিশ্চিন্ত আস্বাদ পায় যেন অঞ্জনা। নীল আর সবুজের দেখা কতটুকুই বা মেলে কলকাতায়, বিশেষ করে মেয়েদের বেলায়? গোসাবার পথ চলতে চলতে তাই আনন্দে প্রাণমন ভরে ওঠে অঞ্জনার।

শান্ত স্তব্ধ গ্রাম-পরিবেশ। কিন্তু অদূরেই কিসের একটা গোলমাল বলে মনে হচ্ছে না ?

হ্যাঁ, তাই। তবে কোনো শহরের হট্টগোল নয়। হাট বসেছে শনিবারে, এ তারই কোলাহল।—শৈবালের প্রশ্নের উত্তরে জানালেন অমরেশবাবু।

পিছিয়ে পড়তে পড়তে ততক্ষণে একেবারে শৈবালদেরই সঙ্গী হয়ে পড়েছেন পরিচালক অমরেশচন্দ্র। শিখাকে একটু কাবু মনে হওয়ায় তাকে কোলে নিয়েই তিনি চলেছেন। এবং এরই মধ্যে শিখা বেশ গভীর ভাবও জমিয়ে নিয়েছে তাঁর সঙ্গে। মুখে যেন তার খৈ ফুটছে। একের পর এক নতুন নতুন প্রশ্ন সে করে চলেছে। সেই সব আজগুবি প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে এমনিতেও একটু হয়রান হবারই কথা।

অমরেশবাবুর পিছিয়ে পড়ার আসল কারণও তাই।

তবে ওর বাবাকে কথা বলতে শুনে শিখা কিন্তু থেমে যায়। আর কোনো নতুন প্রশ্ন করে না। পথের দু পাশের মাঠে অনেক দূর পর্যন্ত ছোট ছোট সরু সরু যে গাছগুলো বাতাসে কেবলই দুলছে, এক একবার একেবারে শুয়ে শুয়ে পড়ছে, আবার উঠছে, সেগুলোই যে-ধানগাছ এবং তাদের খাবারের ভাতের চাল যে এই ধান থেকেই পাওয়া যায় তার শেষ প্রশ্নের এ উত্তর পাওয়ার পর থেকে এক নজরে শিখা সেদিকে শুধু তাকিয়ে আছে।

কিন্তু সুন্দরবনে হাট! বাস্তবিকই চমক লাগে হঠাৎ শুনলে। অঞ্জনা যে তা শুনে বিস্মিত হয়েছে তাতে আশ্চর্য হবার কোনো কারণ নেই। তার ধারণা ছিল, গোসাবায় যে সামান্য কিছু লোকজন থাকে তাদের কেনাকাটা সবই চলে কলকাতায়। অমরেশবাবু সব কথা বুঝিয়ে বলায় তার সেই ভুল ভাঙে।

সত্যি কথা আজ অবশ্য গোসাবা অঞ্চলে লোকসংখ্যা দাঁড়িয়ে গেছে হাজার পনেরো। কিন্তু বিশ শতকের শুরুতে স্কটল্যাণ্ডবাসী স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন যখন এ অঞ্চলে আসেন লোকবসতি স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে, তখন এই অতি আশাবাদী মানুষটি এবং তাঁর আর কয়েকজন সহযোগী ছাড়া অন্য কেউ ভাবতেই পারেন নি, এ এলাকায় কোনোকালে এমনি ভাবে হাট বসবে, মানুষের মিছিল দেখা যাবে, কোলাহলমুখর হয়ে উঠবে গোসাবা পল্লী।

অসংখ্য খালে নালায় ছিন্নবিছিন্ন বনজঙলাময় এই দ্বীপ অঞ্চলটি তখন সমুদ্রের লোনা জলে প্লাবিত হতো অহরহ। কাঠুরে আর শিকারী ছাড়া সে সময় মানুষের মুখ বড় একটা দেখা যেত না কখনো।

সুন্দরবনের আশেপাশের পল্লীগুলোতে তখন মহাজন ও জমিদারের অবর্ণনীয় জুলুম আর শোষণ চলছে চাষী গৃহস্থদের ওপর। এদিকে বৃটিশ সরকারের নির্যাতনে বিক্ষুব্ধ এদেশের সাধারণ মানুষ।

জমিদার মহাজনের কবলমুক্ত একটি সুখী সমাজ গড়ে তুলতে

উদ্যোগী হলেন স্যার ড্যানিয়েল। একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তিনি দেখাতে চাইলেন, সাধারণ মানুষ শান্তিপ্রিয়—নিজ নিজ মান সম্ভ্রম রক্ষা করে সাধারণভাবে খেয়ে পরে থাকতে পারলেই এ দেশের লোক খুশি। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তাঁর পরিকল্পনা রূপায়নে এগিয়ে চললেন তিনি দেশের সরকার ও সর্বসাধারণের বিস্ময় সৃষ্টি করে।

আমাদের দেশের মানুষের জন্যে একজন বিদেশীর এই প্রয়াসের কথা শুনে অঞ্জনাও বড় কম অবাক হচ্ছিল না। বড় বড় চোখ করে অঞ্জনা সে কথাই জিজ্ঞেস করছিল শৈবালকে। অল্প কথায় শৈবাল তাকে জানিয়ে দিলে যে, এর আগেও ভারতের কল্যাণের কথা অনেক বিদেশী ভেবেছেন এবং অনেক মহান বিদেশী অনেক কিছু করেছেনও। তবে স্যার ড্যানিয়েল নতুন দিক থেকে চিন্তা করেছেন এবং নতুন ধরনের একটা কাজে হাত দিয়েছিলেন বলেই এদিকে সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল।

শৈবাল তার কথা শেষ করতেই বৃদ্ধ অমরেশবাবু আবার বলে চলেন কী করে ধীরে ধীরে সুন্দরবনের অভ্যন্তরে গড়ে উঠেছে এই পরিচ্ছন্ন পল্লী গোসাবা।

অজস্র খালের মুখ বন্ধ করে দিয়ে বাঁধের পর বাঁধ নির্মাণ করে পল্লীর বিস্তার যেমন চলতে থাকল একদিকে, তেমনি বাইরে থেকে নতুন নতুন লোক আমদানির সঙ্গে সঙ্গে চাষ-আবাদের কাজও চলতে থাকে। পানীয় জলের ব্যবস্থা হলো জলাশয় খনন করে, প্রতিষ্ঠিত হলো দাতব্য চিকিৎসালয় আর একটি গ্রাম্য বিদ্যায়তন। নিজের খরচে একটি ছোট ডাকঘরেরও পত্তন করলেন স্যার ড্যানিয়েল। বাইরের জগতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হলো বিচ্ছিন্ন গোসাবার এই ডাকঘরের মাধ্যমে। সমবায়ের মাধ্যমে পল্লীর কতদূর উন্নতি সাধন যে সম্ভব স্যার ড্যানিয়েল তাও প্রমাণ করে গেছেন। আজকের গোসাবাই তার সাক্ষ্য। লক্ষ্যে পৌঁছুতে হয়তো আরো অনেক

কাল কেটে যাবে, তা হলেও সমবায়ের পথই যে দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত গ্রাম-ভারতের আর্থিক মুক্তির একমাত্র পথ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

বলতে বলতে অমরেশবাবু যেন একটু বেশি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন, কেমন একটা জড়তা এসে তাঁর কণ্ঠকে যেন মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ করে দেয়।

তবে পরক্ষণেই আবার তিনি হতাশার সুরে বলতে শুরু করেন—তবে কি জানেন শৈবালবাবু, স্যার ড্যানিয়েলের মৃত্যুর পর থেকে আমার কেন জানি কেবলই মনে হচ্ছে, এসব কিছুই থাকবে না। যে সহযোগী বন্ধুর ওপর নির্ভর করে স্যার ড্যানিয়েল এত সব করেছেন তিনিও পঙ্গু অথর্ব। তাঁর পরে এই এস্টেটের ভার নেবার মতো লোক আর দেখছি না। আদর্শ মানুষ না থাকলে একটা বড় আদর্শকে সাধারণ মানুষের সামনে কে তুলে ধরে রাখবে বলুন।

অমনি করে কেন ভাবছেন অমরেশবাবু? এস্টেট বা জমিদারী বলে তো আর কিছু থাকছে না; শিগগীরই সমস্ত জমিদারী লোপ পেয়ে যাচ্ছে—সব সরকারের হাতে চলে যাচ্ছে। সরকারী ব্যবস্থাপনায়ই এখানকার সব কিছু ঠিক্ মতো চলবে, সে সম্পর্কে ভাববার কিছু থাকতে পারে বলেই তো আমি মনে করি না।

শৈবালের কথায় অমরেশবাবুর চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে। তিনি আর ও বিষয়ে কোনো কথা তোলেন না। শুধু শিখাকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বলেন, এই যে আমরা এসে পড়েছি, এটুকু দিদি তুমি বেশ হেঁটেই যেতে পারবে। ঐ যে দেখছ না শাদা দালান বাড়িটা, ওখানে গেলেই তুমি দেখতে পাবে তোমার জন্যে কত খেলনা, কত খাবার! খুব ভাল লাগবে তখন, তাই না?

শিখাও মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, খুব ভাল লাগবে। আর নিজের গালে-মুখে বুলিয়ে বুলিয়ে সে হাতের

গোলাপটিকে আদর করে। লঞ্চ থেকে নামতেই হাতে হাতে একটি করে গোলাপ ফুল দিয়ে তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল। সেই থেকে তার বাবা-মায়ের মতো শিখাও সে ফুলটিকে বেশ সযত্নে হাতে করেই রেখেছে—শিশু-খেয়ালে ফেলে দেয় নি।

মেয়েটিকে খুবই ভাল লেগে গিয়েছে অমরেশবাবুর। তাকে কোলছাড়া করতে তাঁর মোটেই ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু তিনি আর বয়ে নিতে পারছিলেন না শিখাকে। তাঁর বেশ কষ্টই হচ্ছিল।

সেদিকে কিন্তু অঞ্জনার নজর পড়েছিল অনেক আগেই। এরই মধ্যে দু-দুবার সে ডেকে বলেছে, শিখাকে এবার নামিয়ে দিন অমরেশবাবু। টুক টুক করে ও নিজেই দেখবেন আপনার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে চলে যাবে। দরকার হলে আমরা কেউ না হয় কোলে নেবো'খন।

অমরেশবাবু অঞ্জনার কথা গ্রাহ্য করেন নি। যতদূর পর্যন্ত পেরেছেন শিখাকে তিনি কোলে বয়েই নিয়ে এসেছেন। আর এখন তো একরকম কাছারি বাড়ির অতিথিশালার প্রায় গোড়ায়। তাই একটু রাগের সুরেই শিখাকে লক্ষ্য করে বলে ওঠে অঞ্জনা, হতচ্ছাড়া মেয়ে কোথাকার—পুরো পথটাই একেবারে তিনি কোলে চড়ে চলে এলেন! আবদারের বলিহারি যাই!

ও কি, শিশুকে কি অমনধারা মুখ করতে আছে মা!—এই বলে মৃদু তিরস্কার করেন অমরেশবাবু। পথেরও শেষ ঘটে।

পৃথিবীর রঙ বদলে চলেছে তখন। আকাশে সন্ধ্যা নামছে।

মানুষ মরে গিয়েও কী ভাবে তার আপন কাজের মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে এখানে এসে সত্যি তা অনুভব করা যায়।—কাছারি বাড়িতে ঢুকতেই সামনে স্যার ড্যানিয়েলের মর্মর মূর্তি দেখে শৈবালের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে এই কথা। প্রীতিবাদের প্রতীক

এই প্রতিমূর্তি। পারস্পরিক প্রীতিবাদেই সমবায়ের সার্থকতা। শৈবালও যে সমবায়ী। সমবায়ের সফল রূপায়নের নানা দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করে তাই সে এত মুগ্ধ।

স্যার ড্যানিয়েলের নানা কল্যাণ প্রয়াস ও তার সাফল্য দেখে এক সময় রবীন্দ্রনাথও যে তাঁর কত প্রশংসা করেছিলেন কথায় কথায় অমরেশবাবু সে সবেরও উল্লেখ করেন শৈবাল ও অঞ্জনার কাছে। রবীন্দ্রনাথ গোসাবায় এসে যে কুটীরে কয়েকদিন কাটিয়ে গেছেন দর্শকদের জন্যে তা সংরক্ষিত আছে, সে কথাও তিনি জানালেন।

কিন্তু এখন আর কথা নয়। অমরেশবাবু অতিথিদের তাগিদ দিলেন বিশ্রাম গ্রহণের জন্যে, হাতমুখ ধুয়ে কিছু জলযোগ করে নেবার জন্যে।

কাছারি বাড়িতেই অতিথিশালা। পাকা বাংলো বাড়ির এক-তলায় রোজ কাছারি বসে সকালে বিকালে। অনেক রাত অবধি চলে অফিস। স্থানীয় শিক্ষিত লোকদের কাছে এ কাছারিই কলকাতার 'রাইটার্স বিল্ডিংস'। অফিসটি সাজানোও অনেকটা সেই ধরনেই।

অতিথিনিবাস এ বাড়িরই দোতলায়। সুন্দর ফিটফাট। আধুনিক প্রায় সমস্ত রকম ব্যবস্থায় স্বয়ংসম্পূর্ণ।

মধ্যনদীতে মোটরলঞ্চ থেকে এ বাড়িটিরই শুভ্রশোভা হয়তো চোখে পড়েছিল---অঞ্জনা আন্দাজ করে। শৈবালকে প্রশ্নও করে জানবার জন্যে।

শৈবালের হয়ে অঞ্জনার আন্দাজকে সমর্থন করে উত্তর দেন অমরেশবাবু। বলেন, সত্যি সত্যি অনেক দূর থেকেই গোসাবাকে নির্দেশ করে এ বাড়ি। এ বাড়িটাই আমি আপনাদের লঞ্চ থেকে দেখিয়েছিলাম।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। এ বাড়িটাই দেখিয়েছিলেন। চোখে বায়নাকুলার লাগিয়ে আমি দেখেছিলাম। মাত্র দোতলা হলেও বেশ

উঁচু বাড়ি, তাই অতদূর থেকেও বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।—গলার টাইটা খুলতে খুলতে শৈবাল আবার মুখ খোলে।

এই যে এত লোকের আনাগোনা দেখছেন কাছারিতে, এদের বাপঠাকুর্দাদের অনেকেই ছিল কয়েদী শ্রেণীর মানুষ। সমাজে এরা সবাই ছিল অবাঞ্ছিত। অথচ এরাই গড়ে তুলেছে সুন্দরবনের এই সুন্দর পল্লীটিকে।—অমরেশবাবু চায়ের আসরেও নতুন করে আরেকবার গোসাবার প্রসঙ্গ তুলতে ভুল করেন না।

সমবায়ের সুস্থ পথে এই আসামী অসভ্য শ্রেণীর মানুষগুলোর জীবন যে স্বাভাবিক গতিপথ খুঁজে পেল, পরিবার পরিজনের পরিবেশে তাদের যে পুনর্বাসন ঘটল সে কি বড় কম আনন্দের কথা!

সুন্দরবনের ভেতর গোসাবার মতো অন্যান্য আরো যে সব পল্লী গড়ে উঠেছে তার প্রতিটির ইতিহাস প্রায় একই ধরনের। গোসাবা দ্বীপের মতো কাছের আরেকটি দ্বীপ সাতজেলিয়াও স্যার ড্যানিয়েল বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে। চোর ডাকাত খুনেদের দিয়েই তিনি গোসাবার ন্যায় এ দ্বীপটিকেও পশুর রাজ্য থেকে মানুষের বসতিতে পরিণত করেছেন। আর সভ্য জগতের স্পর্শ পেয়ে বন্য মানুষগুলো সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। এ কথা জেনে কার না আনন্দ হবে, বলুন তো!—বলতে বলতে অমরেশবাবু আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন।

কিন্তু সবই তো বুঝলুম, আমাদের প্রোগ্রামটা কি ঠিক করলেন, তাই আগে বলুন দেখি শুনি।—অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে জিজ্ঞেস করে বসে অঞ্জনা।

এতক্ষণ কিন্তু অমরেশবাবুর মুখে গোসাবা এবং সুন্দরবনের গল্প শোনার চাইতেও অঞ্জনার মন ছিল ছাতের ওপর শিখার নাচানাচি ছুটোছুটির দিকেই বেশি।

শিখা মাত্র দু পিস মাখনরুটি ও সামান্য মিষ্টি খেয়ে সেই যে বেরিয়ে এসে ছাতে একক খেলায় মেতে রয়েছে, আর ফেরবার নামটিও নেই।

ছাতের এক কোণায় সে একটি গণেশ মূর্তি আবিষ্কার করে নিয়েছে। বাড়িতে সে তার মাকে দেখে নানা দেবদেবীর ছবিকে ফুল দিয়ে সাজাত। তার মায়ের লক্ষ্মীর আলনায় একটি গণেশের ফটোও আছে। সেই ফটো'ও রোজ সাজানো হয়। কিন্তু এখানে গণেশ বেচারা এমনি পড়ে আছে দেখে শিখা ভারি দুঃখ বোধ করে। তার হাতের গোলাপ ফুলটি সে গণেশের পায়ের কাছে রেখে দেয়। কিন্তু শুধু একটি ফুলে গণেশকে সাজিয়ে সে খুশি হতে পারেনা। তার আরো ফুল চাই, ফুলের কি আর অভাব এখানে? ছাতের ওপরেই তো টবের গাছে গাছে ফুল ভর্তি। কী বড় বড় এক একটা গাঁদা ফুল! এদিকওদিক ছুটোছুটি করে তারই কতগুলো তুলে এনে বেশ সুন্দর করে গণেশ ঠাকুরকে সাজিয়ে নিয়েছে শিখা। আর তাতেই উন্মুক্ত আকাশের নিচে খোলা ছাতে অপার আনন্দে সে নাচানাচি শুরু করে দিয়েছে।

রাত হয়ে গিয়েছে। তা হলেও এখানে ভয় পাবার কিছু নেই। কলকাতার মতোই সুন্দরবনের এই পাড়াগাঁয়ে ইলেকট্রিকের আলো এসেছে। সেই আলোই শিখার মন থেকে সমস্ত ভয়কে দূরে সরিয়ে রেখেছে। তাই তার নির্ভয় আনন্দ এমনি ছেদহীন। আর মেয়ের সেই আনন্দ-নৃত্যই মা চায়ের আসর থেকে বসে বসে দেখছিলেন একদৃষ্টে।

তা হলেও অঞ্জনা চা খেতে খেতে হঠাৎ এমনি ভাবে তাদের প্রোগ্রামের কথাটা পাড়লে, যাতে অমরেশবাবুর গল্প সে শোনে নি এ কেউ মনে না করতে পারে। শুধু শোনা নয়, একেবারে সবই সে বুঝে নিয়েছে এমন একটা ভঙ্গিতে সে প্রোগ্রামের ব্যবস্থা কতদূর কি হয়েছে তা জেনে নিতে চাইলে।

আরে প্রোগ্রামের জন্যে ভাবনা কি, ও তো পাঁচ মিনিটেই ঠিক করে নেওয়া যাবে। কাল সকাল বেলাই আপনাদের সব জানিয়ে দেব।

তাই তো, ঠিকই বলেছেন অমরেশবাবু। প্রোগ্রামের জন্যে তোমারই বা এতটা উতলা হবার কি কারণ ঘটল হঠাৎ?—শৈবালের পাল্টা প্রশ্নে বেশ একটু বিব্রতই বোধ করে অঞ্জনা।

তবু সে বলে, না তেমন কিছু যে উতলা হয়েছি তা নয়। তবে মাত্র তো দু রাতের জন্যে আসা, সোমবারেই আবার ফিরতে হবে। হাতে মাত্র একটি দিন সময়—কাল রবিবার। তাই ভাবছিলাম একবার যখন এসেছি সব কিছুই দেখে যাব। তা না হলে আপশোস থেকে যাবে না! প্রোগ্রামের কথাটা সে জন্যেই তুলেছিলাম।

এরই মধ্যে সব দেখিয়ে দেব, কিছুই বাকি থাকবে না। আর যদি নেহাতই দরকার হয় একটা দিন না হয় বেশিই থেকে যাবেন। শৈবালবাবু একজন কর্তা মানুষ—বড় অফিসার, তাঁর তো আর চাকরির ভয় নেই।

এখানেই একটা মস্ত ভুল করে বসলেন অমরেশবাবু! বড় অফিসারদেরই বেশি করে দায়িত্ববোধ থাকা দরকার। দুর্ভাগ্যের কথা আমাদের মধ্যে সেই দায়িত্ববোধের অভাবের জন্যেই দেশের শাসনকার্যে এত বেশি ত্রুটি-বিচ্যুতি, এত গলতি। যেমন করেই হোক সোমবার আমাকে অফিস করতেই হবে এবং সকাল বেলা এখান থেকে রওনা হতেই হবে।

শুনলেন তো ওর কথা। কিন্তু সুন্দরবনের বাঘ-ভালুক আর হরিণই যদি না দেখা হলো তা হলে কী দেখতে এলুম এখানে বলুন তো! কেন শুধু শুধু আমাদের কলকাতা থেকে টেনে নিয়ে আসা?—অমরেশবাবুকে লক্ষ্য করে বলা হলেও স্বামীর বিরুদ্ধেই তার চাপা অভিমান ও অভিযোগ প্রকাশ পেয়ে যায় অঞ্জনার এই কথা ক'টিতে। রাগে ক্ষোভে সে আরো বলে ফেলে, কেবল অফিস অফিস অফিস আর বাড়িতে ফিরে এসেও কেবল গাদা গাদা ফাইল—আমাদের সঙ্গে ওর আর কতটুকু সম্পর্ক!

প্রবীণ ও প্রখরবুদ্ধি মানুষ অমরেশবাবু। কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে তিনি সহজেই শান্ত করলেন অঞ্জনাকে।

আরে বাঘ-ভালুক সে সব তো নিশ্চয়ই দেখবেন। কিন্তু তার আগে বাঘ-ভালুকের দেশ সুন্দরবনে যে সব মানুষ এসে ঘর বেঁধেছে, হিংস্র পশুদের প্রতিবেশী হিসেবে এখানে বংশপরম্পরায় বছরের পর বছর ধরে বাস করছে তারাও কি দেখার মতো নয়? তাদের কথাও কি শোনার মতো ও জানার মতো নয়? তারও চেয়ে বড় কথা, সুন্দরবনের সাধারণ মানুষ বন্য জন্তুর চেয়েও হিংস্রতর এক ধরনের মানুষের সঙ্গে লড়াই করে, তাদের অত্যাচার ও আক্রমণ সহ্য করে আজো যে কী করে টিকে আছে সে সব কাহিনী শুনতে পেলে নিশ্চয়ই আপনারা অবাক হয়ে যাবেন, এ আমি জোরের সঙ্গেই বলতে পারি।

তেমন দু একটা গল্প এখনই বলুন না অমরেশবাবু, আপনার মুখ থেকেই শুনি।—সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তাব করে বসে শৈবাল।

ব্যস্ত হবেন না শৈবালবাবু! একটা দু'টো নয়, এখানকার লোকজনদের মুখ থেকেই বহু মর্মান্তিক বেদনার গল্প আপনারা শুনতে পাবেন। হ্যাঁ, তবে একটা গল্প আমি নিজেই আপনাদের শোনাচ্ছি, কাশী ভৌমিকের গল্প যা সুন্দরবনের সর্বত্র প্রবাদের মতো ছড়িয়ে আছে, যদিও কাশীকান্ত আজো বেঁচে।

ভারি মজার ব্যাপার তো! একজন জ্যান্ত মানুষকে নিয়েই একটা প্রবাদ দাঁড়িয়ে গেল!

তা হবে না কেন? অঘটন তো চিরকালই ঘটে শৈবালবাবু!—এই বলে কাশীকান্তের গল্প বলতে শুরু করেন অমরেশবাবু।

হাসনাবাদের আবাদ পেরিয়ে সুলখুনির খালের মুখে পড়তে গেলে আগে সেখানে দেখা যেত বিরাট বাদা। নৌকো থেকে প্রায়ই বাঘ চোখে পড়ত। সুলখুনির খাল ধরে এগিয়ে গেলে প্রথমে আবাদ ভবানীপুর, তার পরেই হেলেঞ্চার আবাদ। খালের পার ধরে গুণ

টানবার রাস্তা থাকলেও মাঝি মাল্লারা ভয়ে বড় একটা ডাঙ্গায় নামত না। 'ঐ দেখুন বাবু বড় শেয়াল' বলে কোনো রকমে নৌকো নিয়ে ধীরে সুস্থে এগিয়ে যেত—পারে নেমে গুণ টানতে ভরসা পেত না।

'বড় শেয়াল', আবার কি রকম জন্তু?—শৈবালের এই প্রশ্নে হেসে ফেল্লেন অমরেশবাবু। 'বড় শেয়াল' মানে বাঘ। বাদাবন অঞ্চলে বাঘ কথাটির উচ্চারণ এক রকম নিষিদ্ধ। তাতে নাকি অকল্যাণ হয়, বিপদ ঘটে—সাধারণের মধ্যে এমনি ধারণা বদ্ধমূল। তাই সবাই মিলে এখানে বাঘের নতুন নামকরণ করে নিয়েছে 'বড় শেয়াল' বলে।

বাঃ, চমৎকার ব্যবস্থাই বটে!—শৈবাল খুবই পুলকিত বোধ করে এই কথা শুনে। অঞ্জনাও। তবে কোনো প্রকার উচ্ছ্বাস সে প্রকাশ করে না, চুপচাপ বসে থাকে।

হ্যাঁ, যে কাশী ভৌমিকের কথা বলছিলাম, পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর আগে খালি হাতে এই সুন্দরবনে এসে আস্তানা গাড়লেও তিনি আজ পনেরো বিশলাখ টাকার মালিক। অন্যায়ের পথ ছাড়া, অন্যকে শোষণ না করে কী করে এ সম্ভব হতে পারে শৈবালবাবু?

বিশ লাখ টাকার মালিক, এ কি বলছেন আপনি!

হ্যাঁ তাই, ঐ যে রামপ্রসাদ গেয়েছিলেন 'আবাদ করলে ফলত সোনা'—রামপ্রসাদের সেই গান একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে কাশীকান্তের বেলা। ওকে নিয়ে তাই কত গাল-গল্প যে রটেছে সুন্দরবনে তার অন্ত নেই। সে সব আর বলছি না। তবে ওর সম্বন্ধে যা জানবার কথা তা হলো এই। ছোট-বেলা থেকেই চরিত্রহীন লম্পট কাশীকান্ত। ঘরে বৌ থাকতেও মেদিনীপুরের এই লম্পট তরুণ একটা সাঁওতাল মেয়ের প্রেমে পড়ে ওকে একেবারে 'নয়নতারা' বানিয়ে ফেল্লে। একদিন বল্লে, 'নয়নতারা তুমি বনহরিণী—বনেই তোমাকে মানাবে ভালো, চল আমরা একে-বারে সুন্দরবনে চলে যাই। কতদিন আর এমনি লুকোচুরি খেলব,

বলো।' সোজা সরল মেয়ে নয়নতারা তার খোপায় ফুল গুঁজতে গুঁজতে তার মনভোলানো কথায় সায় দিলে। কাশীকান্ত সেদিনই সন্ধ্যায় পাঁচ সাতটি টাকা ট্যাঁকে নিয়ে নয়নতারার হাতধরে স্বগ্রাম থেকে সেই যে উধাও হলো বহুদিন কেউ আর তার খোঁজখবর পায় নি। কি করে যে সে আবাদ ভবানীপুর অঞ্চলে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল সেও এক আশ্চর্যের ব্যাপার। সুলখানির খালে ডিঙ্গিতে চড়ে যেতে যেতে অন্তহীন অরণ্যের ঘন কালো অন্ধকার কাশীকে বার-বার আকর্ষণ করছিল। তার নয়নতারার আকর্ষণের মতোই তীব্র সে আকর্ষণ। তার মনে কেবলি এই একটি ইচ্ছেই উঁকি মারছিল, জন্তু-জানোয়ার সব তাড়িয়ে এই খালের ধারেই কোথাও একটা বড় এলাকা জুড়ে যদি আবাদের বন্দোবস্ত নেওয়া যায় তাহলে লক্ষ্মীকে বেঁধে ফেলতে আর কতক্ষণ! ডিঙ্গি নৌকার মাঝির সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ তার আশা পূরণের পথ যেন খুলে গেল। সে জানতে পেল কাছেই কয়েক হাজার বিঘের একটা ছোট্ট দ্বীপ হালে জমা নিয়েছেন এক জমিদার। মাঝির ওপর নির্দেশ হলো সেই দ্বীপেই তাদের পৌঁছে দেবার জন্যে। ভাগ্যের মহিমায় জমিদারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল কাশীকান্তের—ভার পেল সে জঙ্গল পরিষ্কার করার। বহু কুলি আনিয়ে কুলি খাটিয়ে সে তার দায়িত্ব পালন করল সুন্দর ভাবে। হাতে টাকা এল অনেক। নয়নতারার নয়ন ঝলমল করে উঠল কাশীর রোজগার দেখে। কিন্তু লোভের তাড়নায় আয়ের বেশি ব্যয় করে বসল কাশীকান্ত নিজে একটা জমি বন্দোবস্ত নিয়ে। তার পুরনো কুলিদের দিয়েই সে তার নিজরে জমিও সাফ করিয়ে নিলে। কিন্তু তাদের অনেক টাকাই পড়ে গেল বাকি। কুলিদের অধিকাংশই সাঁওতাল। তারা এক সময় একেবারে মরিয়া হয়ে উঠল বাকি টাকা পাওয়ার জন্যে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে কাশীকান্ত আর নয়নতারাকে চারপাঁচ দিন পালিয়ে পালিয়ে গাছে গাছে রাত কাটাতে হয়েছিল। শেষ

পর্যন্ত পুরনো মনিবের হাতে-পায়ে ধরে বেশ কিছু টাকা ধার করে এনে সাঁওতাল কুলিদের পাওনা মিটিয়ে তবে তার রেহাই। নয়নতারার ওপরেও ওদের খুব রাগ হয়েছিল। সাঁওতাল মেয়ে অমন একটা ঠকের সঙ্গে ঘর বেঁধেছে সেই জন্যেই সাঁওতাল কুলিরা রেগেছিল। দুজনকেই ওরা একই সঙ্গে খতম করে ফেলবে ঠিকও করেছিল। ভালোয় ভালোয় পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দিতে না পারলে কি যে হতো বলা যায় না।

এতক্ষণ ধরে রুদ্ধনিঃশ্বাসে কাশীকান্তের গল্প শুনে অকস্মাৎ চমকে উঠে প্রশ্ন করে শৈবাল, তাই নাকি—কী ভয়ঙ্কর ?

হ্যাঁ তাই, সাঁওতালরা শান্ত নিরীহ হলেও ক্ষেপে গেলে ওরা ভয়ঙ্কর রূপই ধারণ করে। এমনি দুচারটে ঘটনা সুন্দরবনের এখানে ওখানে হামেসাই ঘটে থাকে। মিষ্টি কথায় নানা কৌশলে ওদের হাতে রেখে কাজ হাসিল করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

শেষ পর্যন্ত সেই পথ ধরেই কাশীকান্ত বড়লোক বনে গেল বুঝি ?

তা বই কি, পাওনা-গণ্ডা বুঝে পেয়ে সাঁওতাল কুলিরা কাশী-কান্তের খুব ভক্ত হয়ে উঠল। কাশীর কথায় এক পায়ে ওরা সব দাঁড়িয়ে পড়ে। হুকুম মাত্র কাশীকান্তের জমির কাটা ও শুকনো কাঠে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো। রাবণের চিতার মতো দাউ দাউ করে আগুন জ্বলল কয়েক দিন ধরে। বর্ষা নামলে তবে সে আগুন নিভল।

তারপর ?

তারপরে আর কি ? এমনি ভাবে জঙ্গল সাফ করে সেখানে ধান বুনে দিল কাশীকান্ত। প্রথম বছরেই প্রচুর ধান হলো। এলো প্রচুর টাকা। নতুন নতুন বসতি গড়ে উঠল চারদিকে। গাঁয়ের নাম হলো আবাদ কাশীপুর। কাশীকান্তের নামে কাশীপুর। সেই ঠক লম্পট কাশী ভৌমিকের কথা আজ আর কেউ ভুলেও মুখে আনে না, কাশীপুরের বাবু কাশীকান্তের আজ কত নাম ডাক ! সাত আটটা

লঞ্চের মালিক, কলকাতার আশেপাশে যার চারপাঁচটা সিনেমা হাউস বিশ-পঁচিশ লাখ টাকার মালিক হওয়া তার পক্ষে এমন একটা কঠিন ব্যাপার কিছু নয়।

বড়লোক হয়ে তার আগের জীবনের সব কথাই বুঝি ভুলে গেছে কাশীকান্ত? সাধারণত তাইতো হয়ে থাকে, সে জন্যেই একথা জিজ্ঞেস করছি।

না, সেদিক থেকে তার একটু সুনাম আছে। সে তার গ্রামকে ভোলেনি, বিবাহিতা স্ত্রী এবং আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ করেছে যথেষ্ট অর্থের মালিক হবার পর। সেই থেকে প্রতি বছরই সে নাকি অন্তত একবার করে তাদের মেদিনীপুরের গাঁয়ের বাড়িতে যায়, মাসখানেক করে থেকে অনেক টাকা-পয়সা খরচ-পত্র করে আসে। তার দানে গাঁয়ের কিছু কিছু উন্নতিও হয়েছে, সেজন্যে গ্রামের মানুষের কাছে তার জনপ্রিয়তাও ক্রমশই বেড়ে চলেছে। আর তার স্ত্রীর কথা কী বলব? শুনেছি, ভাগ্যবতী বলে সারা গাঁয়ে তার সুনামের শেষ নেই। সবাই নাকি বলে, পরম সৌভাগ্যবতী না হলে কি আর অমন রাজা স্বামীকে বছর বছর টেনে আনা যায় সুন্দরবন থেকে!—শৈবালের প্রশ্নের উত্তরে অমরেশের এই কথা শুনে চোখ দুটো অঞ্জনার কেমন যেন হঠাৎ বড় হয়ে উঠে।

তা লক্ষ্য করেই হয়তো অমরেশবাবু বললেন, সে জন্যেই বলছিলাম সুন্দরবনের পশুজগৎ সম্বন্ধে যেমনি, মানুষের জগৎ সম্বন্ধেও ঠিক তেমনি অনেক জানবার বিষয় রয়েছে। আমি সব দিক মিলিয়েই আপনাদের প্রোগ্রাম করে নেবো। কেমন রাজী তো?

অমরেশবাবুর এ প্রশ্নের পর সারা হলঘরটা স্তব্ধ হয়ে থাকে মুহূর্তের জন্যে। অঞ্জনা কোনো জবাব খুঁজে পায় না, কি বলবে কিছু ঠিক করতে পারে না। আবার কি বলতে কি বলে ফেলে অঞ্জনার রাগের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে বিপদ ঘটিয়ে বসবে এই ভয়ে শৈবালও আর তাড়াতাড়ি মুখ খুলতে ভরসা পায় না।

অগত্যা সেই নীরবতাকে খান খান করে ভেঙে দিয়ে অমরেশ-বাবুই বলেন, কাল সকালেই সুন্দরবনের সরল চাষাভুষোদের একদল প্রতিনিধি আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবে। তাদের দেখলেই বুঝবেন কত অত্যাচার কত লাঞ্ছনা তারা দীর্ঘকাল ধরে সহ্য করেছে। তাদের মুখেই তাদের কথা শুনবেন। আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি, তাদের দেখে তাদের কথা শুনে বাঘ-ভালুক দেখার চেয়ে কম ভাল লাগবে না আপনাদের।

নিশ্চয়ই, তাদেরই তো আগে দেখতে হবে। সত্যি অঞ্জনা, তোমার কিন্তু ভারি অন্যায় হয়েছে শুধু বাঘ-ভালুক দেখবার কথা বলে। —খুবই মোলায়েম সুরে স্ত্রী-শাসন করে শৈবাল।

বা রে, কী আবার অন্যায় করা হলো। বাঘ-ভালুক-কুমীর আরো কত কি দেখাবার কথা বলেই তো তুমি শিখাকে সঙ্গে আনতে পারলে। তা নইলে সে তার ঠাকুমার আদর ছেড়ে তোমার সঙ্গে আসতে রাজীই হতো ভারি!

কিন্তু সে তো শিখার কথা। শিখার মা'ও শিখার মতো বায়না ধরবে এটা ওটা নিয়ে, তাও কি প্রশংসনীয় বলতে হবে?

ঠিক আছে শৈবালবাবু, এ কোনো তর্কের ব্যাপার নয়। শিখা এবং তার বাবা-মা সবাইকে খুশি করার মতো ব্যবস্থা বাকি সময়টুকুর মধ্যেই আমরা করতে পারব এ আশ্বাস আমি দিতে পারি।

সে কথা নয় অমরেশবাবু, গভীর অরণ্যের মধ্যে কী ভাবে এমন একটি সুন্দর পল্লী গড়ে উঠেছে এবং কী ভাবে সে পল্লী এগিয়ে চলেছে তা দেখবার জন্যেই আপনি আমাদের আদর যত্ন করে নিয়ে এলেন। তা না দেখে প্রথমেই সুন্দরবনের বাঘ-ভালুক দেখবার দাবি করাটা মোটেই ঠিক হচ্ছে না, মিসেস দাসকে এ স্বীকার করতেই হবে।

তা না হয় মানলুম। কিন্তু নিজে যে এত বড় বন্দুকটা ঘাড়ে করে নিয়ে এলে সে কোন সাধে? শেষ পর্যন্ত সে সাধ যদি পূরণ

না হয় তখন কেমন লাগবে?—আর কোনো পথ না পেয়ে ব্যক্তিগত একটি প্রশ্নের আক্রমণে শৈবালকে কাবু করতে চায় অঞ্জনা।

এদিকে দড়ি টেনে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজায় দারোয়ান। ঘণ্টার খুব জোর আওয়াজ। বহুদূর পর্যন্ত শোনা যায় সেই শব্দ। কাছারিবাড়ির ছাতের ওপরেই প্রকাণ্ড সেই ঘণ্টা। ঘণ্টায় ঘণ্টায় দারোয়ান এসে তা বাজিয়ে যায়। গোসাবার সাধারণ মানুষ সময় জানতে পায় এভাবে।

ঘণ্টার প্রচণ্ড শব্দ শুনে শিখা তার খেলা ফেলে দৌড়ে ছুটে আসে তার মায়ের সামনে। অবাক হয়ে সে ওপরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

রাত তখন আটটা।

উরে বাপস্, গল্পে গল্পে একেবারে আটটাই বেজে গেল! আমি এবার যাই তা হলে, একবার গিয়ে অন্তত দেখে আসা যাক আপনাদের রাত্রির আহারের কতদূর কি বিধি ব্যবস্থা হয়েছে।

তার জন্যে এত ব্যস্ত হবার কি আছে অমরেশবাবু? কলকাতা থেকে একটানা কেবল তো খেতে খেতেই এসেছি। এখানে এসেও জলখাবারের যে বিরাট পর্ব শেষ করা গেল, তার পরে এত তাড়াতাড়ি আরেক দফা আহারের কথা ভাবতেই পারছি না। অন্তত আরো ঘণ্টা দুই আপনি আমাদের খাওয়ার ভাবনা থেকে পুরোপুরি মুক্ত থাকতে পারেন।

তবু একটু দেখে আসি।—এই বলে অমরেশবাবু উঠে পড়েন। কিন্তু পা বাড়াতেই বাধা।

শৈবালও সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে বলে, কিন্তু দেখবেন যেন দেরি না হয়। ঘুমের আগে রোজ রাত্রিতে আমাদের অনেকগুলো করে আবৃত্তি শোনায় শিখা। অন্যকে আবৃত্তি শোনাতে ওর খুব আনন্দ। আপনিও খুব খুশি হবেন ওর আবৃত্তি শুনে।

তাই নাকি, সে তো ভারি মজার কথা!—বলতে বলতে অমরেশ-বাবু সিঁড়ি বেয়ে গটগট করে নিচে নেমে যান। নামতে নামতেই

শুনতে পান অঞ্জনা বলছে শৈবালকে লক্ষ্য করে, তবু ভাল মেয়ের আবৃত্তির কথা বলেছ—আমাকে আবার গান গাইতে বল নি !

এর পরেই অঞ্জনাও বাইরে বেরিয়ে ছাতের উঠোন থেকে শিখাকে ঘরে টেনে নিয়ে আসে।

অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ, শীত না পড়লেও রাত্রির খোলা হাওয়ায় বেশিক্ষণ বাইরে থাকলে বাচ্চা মেয়ের অসুখবিসুখও হয়ে যেতে পারে, এই ভয়।

অমরেশবাবু ফিরে আসতে দেরি করেন না। মিনিট দশেকের মধ্যেই রসুইঘরের তদারকি শেষ করে তিনি শিখার আবৃত্তি শোনার জন্যে ছুটে আসেন। তবে এবার একা আসেন না, সঙ্গে নিয়ে আসেন অরিজিৎবাবুকে।

অরিজিৎ মুন্সী গোসাবা স্টেটের পুরনো আমিন। তবে আজ-কাল তিনি সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকেন এস্টেটের মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে। হালে প্রায়ই তাঁকে বিরক্তির সুরে বলতে শোনা যায়, 'লোকের তুমি যতই ভাল কর না কেন, এই মানুষ জাত এমনই নচ্ছার যে, আইন আদালতের ঝামেলা থেকে তোমাকে সে কিছুতেই রেহাই দেবে না।'

মুন্সীবাবু নামেই অরিজিৎবাবু গোসাবার সর্বত্র পরিচিত। কালো মিশমিশে সেই মধ্যবয়সী লোকটি ঘরে ঢুকেই আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে কিছুটা খুশির আতিশয্য প্রকাশ করলেও শৈবাল তাঁকে চট করে চিনে উঠতে পারে না। সে একটু লজ্জাও পায় তার জন্যে। চুপচাপ বসে দু-এক সেকেণ্ড চিন্তা করে।

মনে হচ্ছে আপনি আমায় চিনতে পারছেন না। আমি আপনার মামাতো বোন কমলার খুড়শ্বশুর। এই তো মাত্র মাসখানেক আগে এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে সত্যেন আর কমলা এখানে বেড়িয়ে গেল।

ও হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। ঠিক মনে পড়েছে। কমলার বিয়ের সময়েই আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তবে সেও তো দেখতে

দেখতে প্রায় চার বছর কেটে গেল। তাই মনে করতে পারছিলাম না কোথায় দেখা হয়েছিল। অপরাধ নেবেন না।—বলেই গুরুজনের প্রাপ্য প্রণামটা মিটিয়ে দেয় শৈবাল এবং তার দেখাদেখি অঞ্জনাও।

না-না, অপরাধ আবার কিসের? সেই বিয়ের পর তো আর দেখাসাক্ষাৎ হয় নি। হঠাৎ মনে না পড়বারই কথা। সে যাই হোক, মামলার হাঙ্গামা সেরে ব্যারাকপুর থেকে ফিরতে আজ রাত হয়ে গেল। তাই এখন আর বিরক্ত করতে চাই নে। তবে আত্মীয়-বাড়িতে একবার তো যেতেই হবে, কাল বিকেলে চা-এর আসরটা আমার ওখানেই বসবে, কি বলেন অমরেশবাবু?

সে হবে'খন। ও নিয়ে আবার ভাবনার কি থাকতে পারে। এদিকে আমাদের শিখাদিির না জানি ঘুম পেয়ে গেল! আগে ওর আবৃত্তিটা শুনে নি। এস দিদি, এদিকে এস দেখি। সুন্দর সুন্দর কখানা পদ্য শুনিয়ে দাও তো আমাদের।—এই বলে অমরেশবাবু কাছে টেনে নেন শিখাকে। পরক্ষণেই আবার বলেন, কিন্তু ওর খাওয়াটা তো আগেই শেষ করে নেওয়া উচিত। তা নইলে দিদিমণি হয়তো ঘুমিয়েই পড়বে। শেষ অবধি হয়তো বেচারার রাতের খাওয়াটাই হবে না।

না-না, এইমাত্র ওকে হরলিক্স আর সন্দেশ খাইয়ে দিয়েছি। এখন ও আর কিছু মুখেও নেবে না।—অঞ্জনা জানিয়ে দেয়।

ও তাই বুঝি! বেশ, তাহলে বসে বসে আবৃত্তিই শোনা যাক নাও, এবার তবে আরম্ভ করে দাও।—অমরেশবাবু তাকে আদর করে পিঠ চাপড়ে এ আদেশ করতেই শিখা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে টালুমালু করে তাকায় একবার তার বাবার দিকে, একবার মায়ের দিকে। সেই তাকানোর মধ্যে একটা গর্বের ছায়া স্পষ্ট হয় ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের 'হারিয়ে যাওয়া' কবিতাটি দিয়ে আবৃত্তি শুরু করতে বলে অঞ্জনা।

মায়ের অভয়বাণী পেয়ে শিখা আরো হাসিখুশি। সে সম্পূর্ণ

নির্ভয়। নিঃসঙ্কোচ। উচ্চারণের অস্পষ্টতা সত্ত্বেও তার অপূর্ব ভঙ্গিতে বলার মিষ্টতায় অমরেশবাবু ও মুন্সীবাবু মুগ্ধ হয়ে শিখার কণ্ঠে শোনেন :

ছোট্ট আমার মেয়ে
সঙ্গিনীদের ডাক শুনতে পেয়ে
সিঁড়ি দিয়ে নীচের তলায় যাচ্ছিল সে নেমে
অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে, থেমে থেমে
হাতে ছিল প্রদীপখানি,
আঁচল দিয়ে আড়াল করে চলছিল সাবধানী॥

... .

তারায়-ভরা চৈত্রমাসের রাতে
ফিরে গিয়ে ছাতে
মনে হল আকাশ পানে চেয়ে,
আমার বানীর মতোই যেন অমনি কে এক মেয়ে
নীলাম্বরের আচলখানি ঘিরে
দীপশিখাটি বাঁচিয়ে একা চলছে ধীরে ধীরে।
নিবত যদি আলো, যদি হঠাৎ যেত থামি
আকাশ ভরে উঠত কেঁদে, 'হারিয়ে গেছি আমি'।

প্রথম আবৃত্তি শেষ করে শিখা হেসে ফেলতেই 'অপূর্ব, অপূর্ব' বলে চিৎকার করে ওঠেন মুন্সীবাবু। আর অমরেশবাবু, কোলে টেনে জড়িয়ে ধরে আদরে আদরে অস্থির করে তোলেন ওকে।

এই একরত্তি মেয়ে এত বড় একটা কবিতা অনর্গল বলে গেল, আশ্চর্য!—গভীর বিস্ময় প্রকাশ করলেন মুন্সীবাবু।

কিন্তু তবু ছাড়াছাড়ি নেই। শিখাকে পরপর আরো তিনখানা আবৃত্তি শোনাতে হলো। রবীন্দ্রনাথের 'খেলনার মুক্তি'—এক আছে মণিদিদি, আর আছে তার ঘরে জাপানী পুতুল—নাম হানাসান।... কাল হবে অধিবাস, পরশু হবে বিয়ে।...ইত্যাদি।

এর পর সত্যেন দত্ত ও নজরুল ইসলামের একখানি করে আবৃত্তি শুনিয়ে তবে শিখার নিষ্কৃতি।

ঘুমও পেয়ে গেছে মেয়ের। ছুটে গিয়ে শিখা পাশের ঘরে শুয়ে পড়ে। অঞ্জনা বল্লে, নটার মধ্যেই ওর ঘুমোনোর অভ্যেস। আজ তো হৈ-হল্লায় মেতে গিয়ে তবু দশটা পর্যন্ত জেগে রয়েছে।

অমরেশবাবু তাঁর বুকপকেট থেকে ঘড়ি বার করে দেখলেন, সত্যি সত্যি তখন রাত দশটা বেজে পাঁচ।

তার পর রাতের খাওয়া সারতে সারতে আরো প্রায় এক ঘণ্টা। খাবারের মেনুর যেন আর শেষ নেই। একটু একটু করে মুখে দিতে দিতেও শৈবাল হাঁফিয়ে ওঠে। অঞ্জনারও একই অবস্থা। শেষ পর্যায়ে এসে আর কোনো কিছুতেই ওদের হাত দিতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

কিন্তু কী সুন্দর চেছেমুছে খেয়ে চলেছেন ওরা দু'জন—মুন্সীবাবু আর অমরেশবাবু! এবং ওঁদের পীড়াপীড়িতেই একটু একটু করে অতিভোজনে অস্বস্তি বোধ করতে হচ্ছে শৈবাল এবং অঞ্জনাকে।

বা রে, ওই জিনিসটাই সরিয়ে রাখছেন? কিছুই তো খেলেন না, কিন্তু সুন্দরবনের যা আসল বৈশিষ্ট্য তাকে এমনি ভাবে উপেক্ষা করা তো চলতে পারে না।

সত্যি কথা, একেবারে খাঁটি কথা বলেছেন মুন্সীবাবু। এখানে আমরা সুন্দরবনের খাঁটি মধু খাইয়েই অতিথিদের ভোজনপর্বের সমাধা করে থাকি।

অনুরোধে ঢেঁকিও গিলতে হয়। এবং শৈবাল-অঞ্জনাকেও তাই করতে হলো। ছোট্ট শ্বেত পাথরের বাটি থেকে দু'জনকেই একটু করে খাঁটি মধু চাখতে হলো। স্বাদ চমৎকার, কিন্তু সঙ্গী দু'জনের মতো সে মধু নিঃশেষে শেষ করা ওদের দু'জনের পক্ষেই দুঃসাধ্য।

বিদায় নিয়ে অমরেশবাবু ও মুন্সীবাবুর বেরিয়ে যেতে যেতে রাত এগারোটা পেরিয়ে যায়। অমরেশবাবু তো কাছারি বাড়িরই বাসিন্দে,

মুস্কিল অরিজিৎবাবুর।—তাঁকে হেটে যেতে হবে অনেকটা পথ। তাই তাঁরই বেশি তাড়া।

তাঁদের বিদায় দিতে শৈবালও একবার ছাতে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ায়। বাইরে চতুর্দিক নিঝুম নিস্তব্ধ। ওরা চলে যাবার পর শৈবালের গাটা কেমন যেন ছমছম করে উঠল। ভাগ্যি, অঞ্জনা তার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে নি। তা হলে নিশ্চয়ই সে ভয়ে হয়তো চিৎকার করেই উঠত। তবু তো এখন শুক্লপক্ষের রাত চলছে। তা নইলে কৃষ্ণপক্ষের রাতে বাইরের ঘোর অন্ধকারের দিকে একবার চোখ পড়লে আর রক্ষা থাকত না, সারা রাত অঞ্জনা চাদর মুড়ি দিয়ে বিছানায় ঢুকড়ে পড়ে থাকত—খাওয়া-দাওয়ার কথা কানে পর্যন্ত তুলত না। সে সব ভাবতে ভাবতেই চটপট ঘরে ঢুকে খিল আটকে দেয় শৈবাল।

ত্ব ঘরে ত্বটো হ্যাজাক লাইট জ্বলছে সেই সাড়ে আটটা থেকে। নটায় ইলেকট্রিকের আলো বন্ধ হয়ে যায় বলে অতিথিশালার জন্যে এই ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা ছিল বলেই অঞ্জনার তেমন কোনো ভয়-ডর লাগে নি। তা ছাড়া অমরেশবাবু এবং মুন্সীবাবু ছিলেন, রাত এগারোটা পর্যন্ত বেশ হৈ-চৈ করেই কেটে গেছে।

এবার বেশ ঘুম পেয়ে গেছে অঞ্জনার। শৈবালেরও। কিন্তু আলো নেভানো চলবে না। অঞ্জনারই নিষেধ। অজানা-অচেনা জায়গা। রাত্তিরে কখন কার উঠতে হবে, তাই।

ওরা ঘুমিয়ে পড়ে শিখাকে মাঝখানে রেখে।

অজানা-অচেনা রাজ্যে ত্বটি হ্যাজাক লাইটের আলো, ওদের পাহারাদার। মুন্সীবাবুকে এগিয়ে দিয়ে এসে অমরেশবাবু কখন কাছারি বাড়ির ছাতের ওপর ওঁর নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছেন শৈবাল না অঞ্জনা তার বিন্দুবিসর্গও টের পায় নি।

॥ তিন ॥

পরদিন সকাল সকাল ঘুম ভাঙলেও বিছানা ছেড়ে উঠতে উঠতে শৈবালদের বেশ দেরি হয়ে যায়। নানা জাতের পাখির কল-কাকলি, কাকের কা-কা রবে বেলা অবধি ঘুমোনোর উপায় আছে সুন্দরবনের গ্রামাঞ্চলে? নেহাৎ ক্লান্তি এবং আলস্যের জন্যেই এতক্ষণ বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে নি শৈবাল এবং অঞ্জনা।

অমরেশবাবু অনেকক্ষণ আগেই একবার লোক পাঠিয়ে খোঁজ নিয়েছেন অতিথিরা উঠেছেন কিনা, তাঁদের চা পাঠান হবে কিনা।

সে লোক গিয়ে খবর দিয়েছে, ঘরে তখনো আলো জ্বলছে—সবাই ঘুমোচ্ছেন। দ্বিতীয়বার আধঘন্টা বাদে খবর নিতে গিয়ে দোরে ছোট্ট করে টোকা দিতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসে শৈবাল।

আরে এই ওঠো, অমরেশবাবু বোধ হয় খোঁজ করছেন।—এই বলে অঞ্জনাকেও ঠেলে তোলে। আর এই হল্লায় শিখারও ঘুম ভেঙে যায়। সেও গায়ের চাদর সরিয়ে উঠে বসে চোখ রগড়াতে থাকে।

বাবু, আপনাদের চা নিয়ে আসব?

হ্যাঁ নিয়ে এস।—বাইরের হাঁকের এই উত্তর দিয়ে খাট থেকে নিচে নেমে এসে তাড়াতাড়ি হ্যাজাক লাইট দুটো নিভিয়ে দেয় শৈবাল। তারপর দোর খুলে দেখে বাইরে কত বেলা—রীতিমত চারিদিক ছেয়ে গেছে রোদে! লজ্জায় সে জিভ কাটে।

যারা কাজের মানুষ এমন সময় বেড-টি খেলে তাদের চলে? কোনো কাজ মাথায় নিয়ে এখানে আসা হয় নি তাই রক্ষে!—মনে মনে কিছুটা আত্ম-তিরস্কারের পর কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পায় শৈবাল এই ভেবে।

এ দিকে চাওয়ালাকে সঙ্গে নিয়েই স্বয়ং অমরেশবাবু হাজির। —কী, ভাল ঘুমটুম হয়েছিল তো রাতে? কোনোরকম অসুবিধে হয় নি তো?

না না, কিছু না। শোবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম। তারপর কখন রাত ভোর হয়েছে তাও ভাল করে টের পাই নি। এক আধবার কাকের ডাক পাখির কিচির-মিচির কানে গিয়েছিল মাত্র। দেখছেন না কত দেরি হলো উঠতে। আমরা সত্যি বেঘোরে ঘুমিয়েছি।

তা তো হবারই কথা। সারাদিন ধরে দৌড়াদৌড়ি ছুটোছুটি তো বড় কম হয় নি। তা হলেও আমি কিন্তু অনেকক্ষণ আগেই জেগেছি। তবে এসব হাঁটাহাঁটি খাটাখাটিতে আমরা অভ্যস্ত। এ ধরনের ছুটোছুটিতে আপনাদের মতো লোকের ক্লান্ত হয়ে পড়ারই কথা। ঐ যে মুন্সীবাবুও এসে পড়েছেন দেখছি গাঁয়ের চাষী প্রতিনিধিদের নিয়ে। নিন ধীরে সুস্থে আপনারা চা-টা খেতে থাকুন। ওরাআপনাদের সঙ্গে আলাপ করতেই আসছে। ওদের সঙ্গে কথাবার্তার পর ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা হবে।—এই বলে অমরেশবাবু নিজেও এক কাপ চা তুলে নিলেন এবং বয়কে আরেক পট চা আনবার অর্ডার দিলেন।

স্লিপিং স্যুটের ওপরেই একটা চাদর জড়িয়ে নিয়ে শৈবাল চায়ের কাপে চুমুক দিতে শুরু করে দিয়েছে অমরেশবাবুর সঙ্গে গল্প করতে করতে। শিখাকে নিয়ে অঞ্জনার এসে আসরে বসতে বসতে মুন্সীবাবুও সদলবলে ওপরে উঠে এসেছেন।

ঐ দলের মধ্যে নানা জাতের লোক। সাঁওতালী আছে, দাগী দুর্বৃত্ত শ্রেণীর লোক আছে এবং নিরীহ আদিবাসী চাষীও আছে। তারা সকলেই প্রায় গড় হয়ে প্রণাম করে অতিথিদের। সুন্দর তাদের স্বাস্থ্য, তারা হাসিখুশি, কিন্তু বেশবাসে দারিদ্র্যের নির্মম স্বাক্ষর। স্যার ড্যানিয়েল এদের অন্যবিধ অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করলেও অভাবের কবল থেকে মুক্ত করতে পারেন নি, এদের দেখে মনে মনে এই ধরণাই করে শৈবাল।

বলো হে, কী তোমাদের বলবার আছে, বলো সাহেবকে। নোনাজলে তোমাদের চাষ-আবাদ যাতে নষ্ট হয়ে না যায় এই হুজুরই তার ব্যবস্থা করতে পারেন। সব কথা খুলে বলো হুজুরকে। —আসল সমস্যাটা অমরেশ বাবু ওদের ধরিয়ে দেন এইভাবে।

দুখন এগিয়ে আসে হাত জোড় করে। ভয়ে ভয়েই দুখন সর্দার সবিনয়ে তাদের দুঃখের কথা জানায়। এই সন্দেশখালি এলাকায়ই প্রথম আমলে জঙ্গল সাফ করতে এসে ওর বাপ কি করে বাঘের খাবায় প্রাণ হারিয়েছে সেই কাহিনী বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলে দুখন। ষাট বছর আগে সেই অঘটন যখন ঘটেছিল তখন দুখনের বয়স ছিল আট বছর। সেই থেকে আজও অবধি সে কেবল লড়াই-ই করে চলেছে, কিন্তু দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া আর হলো না, দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার জন্যে আপশোস করে দুখন। তার-পর তৃপ্তির সঙ্গে একটা প্রশ্ন তোলে—আচ্ছা হুজুর, জমিনদারিগুলির নাকি উচ্ছেদ লাগব? ঠিক লাগব তো কর্তাবাবু? তাইলে যদি আমাগো মতন লাখ লাখ লোকের দুঃখু মিটে।—এই কথা কটি বলতে বলতে এক ঝলক হাসির রশ্মি মিলিয়ে যায় ওর চোখে মুখে। সেই নোনাজলের সমস্যার আসল কথাটাই দুখনের ভুল হয়ে যায় বলতে। দণ্ডবৎ হয়ে সে পিছিয়ে যায়।

এবার এগিয়ে আসে গোসাবারই স্কুলে-পড়া ছেলে মদন মাঝি। একমাত্র তারই গায়ে একটা হাতাকাটা ফতুয়া। চাষী শরৎ মাঝির ছেলে হলেও বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলতে শিখেছে সে। দু চার খানা বই পড়েছে, কয়েকটা ক্লাস পাশও করেছে, তার ফল হবে না কিছু?

সুন্দরবনের জমিদারদের নিষ্ঠুরতার নানা কাহিনীই জানা আছে মদনের। এক এক করে তার অনেকগুলিই সে অতিথিদের শুনিয়ে দেয়। দুখন সর্দারের বাপ নিজের জীবন দিয়ে যে জমিদারকে তার দলবলের সাহায্যে জঙ্গল সাফ করে প্রায় সাত শ বিঘে জমির

মালিক করে দিয়েছিল, সেই জমিদার তখন সর্দারের মাকে তার স্বামীর জীবনের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ মাত্র দশটি টাকা হাতে তুলে দিয়েছিলেন, মদনের মুখে একথা শুনে শৈবাল শিউরে ওঠে, অঞ্জনার চোখে আর পলক পড়ে না।

কাঁচা বাঁধ ভেঙে বছর বছর বন্যার লোনাজল সুন্দরবনের প্রজাদের যে সর্বনাশ করে, শেষপর্যন্ত তার একটি করুণচিত্রও উপস্থিত করে মদন মাঝি। গত বছরের বন্যা ও দুর্ভিক্ষের ফলে সুন্দরবনের কত সর্বহারা মানুষ যে বাঁচবার আশায় কলকাতায় গিয়ে অনাহারে ফুটপাতে প্রাণ হারিয়েছে তারও অনেক কথা সে উল্লেখ করে অতিথিদের সামনে।

দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীন দেশের সরকার তাদের দুঃখ-দুর্দশা নিরসনের দিকে নিশ্চয়ই এবার দৃষ্টি দেবে, লোনাজলের বন্যায় বছর বছর যাতে তাদের সোনার ফসল আর নষ্ট না হয় তার ব্যবস্থা করবে, শৈবালের মুখ থেকে এ আশ্বাস পেয়ে মদন মাঝি বিদায় নেয়।

আমি হুজুর দাকুপির (দাকোপের) চাষী। দেশ ভাগ হলি এই গোসাবায় আশ্রয় নিছি।—এক পাশ থেকে লম্বা চওড়া চেহারার বদন-মণ্ডল পেন্নাম দিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করে তার নিজের কথা। নিজের কথা বলতে বলতেই দেশ ভাগের আগে বাংলা দেশে তেভাগার দাবিতে কৃষক আন্দোলন কিরূপ দানা বেঁধে উঠেছিল এবং মানুষের মতো হয়ে বাঁচবার আশা তখন তাদের কেমন পেয়ে বসেছিল তারই সুন্দর বিবরণ সে তুলে ধরে। কিন্তু বাংলা দেশের, বাঙালী চাষীর এবং সাধারণ মানুষের অদৃষ্টই খারাপ, ঠিক তখনই স্বাধীনতার নামে দেশটাকে দু টুকরো করে ফেলা হলো। আর তাদের তেভাগা আন্দোলনও খান খান হয়ে গেল।

বলতে বলতে কান্নার জোয়ার নেমে আসে বদন মণ্ডলের চোখে। কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছতে মুছতেই সে বল্লে, কোন শয়তান

আচোমকা কল ঘুরোয় দিলো হুজুর—আমাগো নিজিদের মধ্যিই হুজুর লড়াই বাধায়ে দিল্যে। রব উঠলো দাকুপ মুছলমানের রাজ্জা, গোটা খুলনা জেলাই মুছলমানের। জীবনপণ কোর‍্যে বাপ-পিতোমর যে জমি-জমা এতকাল আঁইকড়েছিলাম হুজুর, তা সব ছাইড়্যে ছুড়্যে দিয়ে আমরা সব দলে দলে পালায় আলাম। আশা ভরসা সব বানচাল হোয়ে গ্যালো, এহানে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে কোনোরকোমে বাঁচি আছি কর্তা।—এই বলে আবার বদন চোখ রগড়াতে থাকে।

বদনের বলা তখনো শেষ হয় নি। দাকোপ ছেড়ে এলেও দাকোপের ইতিহাস তার মনের রাজ্য অধিকার করে আছে। রক্তাক্ত সে ইতিহাস। সত্তর-পঁচাত্তর বছর আগেও সেখানে কোনো মানুষের বাস ছিল না। ভয়ঙ্কর কুমীর আর মারাত্মক সাপের ছিল ছড়াছড়ি, আর খাঁটি রয়েল বেঙ্গল টাইগারের অবাধ বিচরণে সুন্দরবনের সেদিকটা ছিল সত্যি সত্যি মানুষের পক্ষে অগম্য। কিন্তু জীবিকার অন্বেষণে মানুষ চিরকালই সব রকম বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এসেছে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। জমির অভাব দূর করার জন্যে পশ্চিম খুলনার প্রথম অভিযানকারী কৃষক দলের সঙ্গে বদনের পূর্বপুরুষরাও দক্ষিণ খুলনার অন্তর্গত এই থানা এলাকা পত্তনে অগ্রণী হয়েছিল।

দিনের বেলায় বাদা কেটে কেটে এগিয়ে চলেছে সেই কৃষকের দল। দায়ের কোপের তালে তালে তারা এগিয়েছে আর চিৎকার তুলেছে। ভয় পেয়ে দূরে দূরে সরে গিয়েছে হিংস্র পশুরা। তবু অনেককে সাপে কেটেছে, অনেকে আবার সকলের অজান্তে বাঘের মুখে কুমীরের কবলে প্রাণ হারিয়েছে। জঙ্গল সাফ করতে করতে যেই নজরে পড়েছে সূর্য ডুবু ডুবু হতে চলেছে, অমনি সবাই হাঁফিয়ে ঝাঁপিয়ে গাছের ওপর উঠে টোঙায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। রাতের পর রাত কাটিয়েছে তারা ঐসব টোঙায়। কাপড়ের আঁচলে বাঁধা চিঁড়েগুড় সম্বল। সুন্দরবনের ফলফলাদিও জুটেছে মাঝে

মাঝে। কিন্তু অনেকের পক্ষে এমনও অনেকদিন গেছে যখন গাছের ওপরের টোঙা থেকে তারা নেমে আসবারই সুযোগ পায় নি। কী করে নামবে, রক্তলোভী বাঘ যে নিচে ওৎ পেতে বসে আছে শিকারের আশায়! এমনি ভাবেই নিজ নিজ প্রাণ হাতে নিয়ে দলে দলে যে সমস্ত কৃষক দায়ের কোপে কোপে এখানকার শতাধিক বর্গমাইল জমি উদ্ধার করেছে, তাদেরই দুঃসাহসিক অভি-যানের সাক্ষ্য বহন করছে এই থানা এলাকার দাকোপ নাম। কিন্তু তা হলে কি হবে, নামমাত্র খাজনায় সে সব জমি সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে জমা নিয়ে জমিদারেরা সেই সব কৃষক পরিবার ও তাদের সন্তান-সন্ততিদের ওপর বছরের পর বছর যে সব অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে এসেছেন, জমিদারদের লালসার আগুন থেকে চাষী পরিবারের সুন্দরী বৌ-ঝিদের রক্ষা পাওয়াও যে অনেকসময়ে কিরূপ অসম্ভব হয়ে উঠত পরপর তারই বিবরণ দিতে যেয়ে বদন মণ্ডল বাধা পায় অমরেশবাবুর কাছে।

বদন তখন আর কথা না বাড়িয়ে শুধু মন্তব্য করে যে, সুন্দরবনের যেখানে যত বসতি গড়ে উঠেছে তার প্রত্যেকটির ইতিহাসই ঐ দাকোপের মতো কৃষকের অশ্রুর আখরে লেখা।

আমাগো দুঃখের দিন কি শেষ হব্যানে না হুজুর?—এই প্রশ্ন রেখে বদন শেষ করে তার বক্তব্য।

নিশ্চয় হবে, দেশ স্বাধীন হয়েছে, ধীরে ধীরে সবারই দুঃখ দূর হবে।—আশ্বাস দেয় শৈবাল।

মুন্সীবাবু এবার দাঁড়িয়ে উঠে জিজ্ঞেস করেন, আর কারো কিছু বলার নেই তো তোদের? হুজুরকে নিয়ে আমরা একটু বেড়াতে যাব কিনা, তাই আর বেশি কথা এখন না বলাই ভাল।

মাধু সাঁওতাল কাচুমাচু হয়ে এগিয়ে এসে বলে, সুন্দরবনের দশ-বারো হাজার সাঁওতালের দুঃখের কথা আমি আর এখন কইব না

কর্তাবাবু। আমার ঘরে উচ্ছব হইছে। তুই যাবি হুজুর আমার বেটির বিয়া দেখতে?

বাঃ ভারি মজার ব্যাপার তো! নিশ্চয় যাবো। কখন বিয়ে, কখন?—শৈবাল উৎফুল্ল হয়ে উঠে প্রশ্ন করে। বিয়ে দেখবার ব্যাপারে অঞ্জনা এবং শিখারও প্রবল উৎসাহ। তাই মাধু যখন বিকেল বেলা তাদের সকলকে তার বাড়িতে যাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করল তখন ওদের কী আনন্দ!

চাষীরা সবাই খুব খুশি। ওদের প্রত্যেকের কথাই শৈবাল খুব মন দিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে শুনেছে, এজন্যেই ওদের আনন্দ। তা ছাড়া ওদের সকলের দুঃখই ধীরে ধীরে দূর হবে সরকার বাহাদুর নিশ্চয়ই সে ব্যবস্থা করবেন, এ আশ্বাসও কি এই সব সর্বহারাদের কাছে বড় কম আশার কথা!

হাসিখুশি হয়ে গাঁয়ের প্রতিনিধিরা বিদায় নিয়ে যাবার পরেই খুব চটপট করে ব্রেকফাস্টের পর্বটা মিটিয়ে নেন অমরেশবাবু।

ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে অনেক কিছুই কিন্তু দেখতে হবে শৈবালবাবু, তাই একটু তাড়া দিচ্ছি, মনে কিছু করবেন না।—এই সাবধানবাণী দিয়েই অমরেশবাবু আরম্ভ করেছেন। তাই প্রাতরাশ সেরে সাজপোশাক করে বেরিয়ে পড়তে আর খুব বেশি দেরি হয় না।

.

সকালবেলা কৃষকদের এনে ভিড় জমানোর খুব একটা ইচ্ছা ছিল না অমরেশবাবুর। কিন্তু শৈবালের ইচ্ছাতেই তাঁকে এ ব্যবস্থা করতে হয়েছে। তা না হলে অনেক আগেই বেরিয়ে পড়া যেত। ধীরে সুস্থে সব কিছুই ভাল করে দেখা হতো।

যাই হোক এক এক করে তবু কমই বা কি দেখা হলো!

কো-অপারেটিভ রাইস মিল, কো-অপারেটিভ স্টোর, সমবায় কৃষি সংস্থা, কুটির শিল্পাশ্রম, উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় ও হোস্টেল এবং দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দেখা শেষ করে

শৈবালরা যখন ফিরতি মুখে তখন এমন এক ঘটনা ঘটে বসল যার কথা ওদের মধ্যে কেউ বিন্দুবিসর্গও ভাবতে পারে নি।

সকাল বেলা বেরুবার সময় একটু একটু শীতের আমেজ বোধ হলেও ক্রমে ক্রমে রোদ বেশ কড়া হয়েই উঠেছে। রোববার দিন স্কুল বসেছে। সস্ত্রীক শৈবালবাবুর পরির্শনের জন্যেই এই বিশেষ ব্যবস্থা। রোববারের বদলে সোমবার ছুটি থাকবে।

স্কুল অবধি শিখাকে নিয়ে কোনো বেগ পেতে হয়নি। বরং নিচের ক্লাসগুলো দেখাতে নিয়ে গেলে সে সব ক্লাসের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দেখে শিখার ভারি আনন্দ হয়েছে। ছেলেমেয়েরা একই সঙ্গে সবাই দাঁড়িয়ে উঠে হাতজোড় করে যখন এক এক ক্লাসে তার বাবা-মাকে অভিবাদন জানিয়েছে তখন তা অদ্ভুত ভাল লেগেছে তার।

আমিও মা স্কুলে পড়ব। আমায় ভর্তি করিয়ে দাও না মা!—শেষ ক্লাস থেকে বেরিয়ে এসেই আবদার ধরেছে শিখা।

মায়ের আশ্বাস পেয়ে তখনকার মতো শান্ত হলেও একটুখানি যেতে না যেতেই শিখা বসে পড়েছে। আসলে তার আর হেঁটে চলার ক্ষমতা নেই। স্কুলের পর হোস্টেল এবং তারপর দাতব্য চিকিৎসালয় পর্বন্ত অঞ্জনা নিজেই কোনো রকমে মেয়েকে চালিয়ে নিয়ে এলেও তারপরে আর এক পা-ও শিখা পায়ে হেঁটে চলতে নারাজ।

অগত্যা সেই থেকে এ-কোল সে-কোলে চড়ে চড়েই শিখার বেড়ানো হচ্ছে ফিরতি পথে।

একটু আগেই বাবার কোল ছেড়ে শিখা গিয়ে তার মায়ের কোলে পাড়ি জমিয়েছে। দলের সবার পেছনে পেছনে চলছে তারা মা-মেয়ে। আর তাদের ঠিক আগে আগেই চলেছে শৈবাল।

আর বেশি হাঁটতে হবে না। ঐ তো সামনের বাঁকটা পেরিয়ে গেলেই কাছারিবাড়ি চোখে পড়বে। বড় জোর আর আধমাইলটাক

পথ। তার বেশি কিছুতেই নয়।—জোরে জোরে চেঁচিয়ে বললেও অমরেশবাবুর এ আশ্বাসে খুব খুশি হতে পারছে না অঞ্জনা। পা যে আর তারও চলছে না। এত দীর্ঘ পথ সে কি আর জীবনে কোনোদিন হেঁটেছে? তার ওপর আবার এমন এক ঢেঙা মেয়েকে কোলে নিয়ে!

শিখার ওপর মনে মনে খুব চটে গিয়েছে অঞ্জনা। সে বিরক্তি আর খুব বেশিক্ষণ সে চেপেও রাখতে পারে না। কোল থেকে ওকে নামাতে গিয়ে বাধা পেয়ে ক্ষেপে ওঠে অঞ্জনা, নচ্ছার মেয়ে কোথাকার। এমন জানলে তোকে ঠাকুমার কাছেই রেখে আসতাম, সেই ভাল হতো।

কথাগুলো শুনতে পেয়ে শৈবাল থমকে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, মুন্সীবাবুর কানে যাওয়ায় তিনি ছুটে এসে, 'আহা, অমন কচি শিশুকে কি এমনি করে বকতে হয় মা' বলে নিজের কোলে তুলে নেন শিখাকে।

এতক্ষণে অঞ্জনা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

নিশ্চিন্ত মনে কয়েক পা এগুতেই হঠাৎ রাস্তার একপাশের একটা বাংলো মতো বাড়ি থেকে একই সঙ্গে বেরিয়ে এলেন জন চার লোক। হৈ-হৈ করতে করতেই তাঁরা এসে রাস্তায় নামলেন এবং শৈবালদের পিছু নিলেন।

একবার পিছন দিকে তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে হলো অঞ্জনার। ইচ্ছে নয়, আপনা থেকে নিজের অজান্তেই কখন সে একবার তাকিয়ে নিয়েছে পিছন দিকে। দেখে নিয়েছে, একেবারে গায়ে গায়ে নয়—বেশ একটু দূরেই রয়েছে পিছনের দলটি। তবে সে দূরত্বটুকু তাদের কথাবার্তা শোনার পথে মোটেই কোনো বাধা নয়। আর তাদের নিয়ে ওরা যে কোনো আলোচনা করছেন না সেটুকু জেনেই অঞ্জনা খুশি।

কিন্তু পিছনের দলটিতে সামনের দু'জনের মধ্যে এক জনের চেহারা ঠিক মাস্টার মশাইয়ের মতো মনে হচ্ছে না?—আরেকবার

মুখ ঘুরিয়ে নজর করতেই কেমন যেন খটকা লাগে অঞ্জনার মনে। সন্দেহ ভঞ্জনের জন্যে আবার সে তাকিয়ে দেখে। কিন্তু ভরসা পায় না থামতে। কি জানি যদি ঠিক না হয়! তা হলে লজ্জায় যে মরে যেতে হবে তাকে। সেই ভয়েই সে নীরবে এগিয়ে চলতে থাকে।

কিন্তু এরই মধ্যে আরেক দিকেও যে সন্দেহের দোলা লেগেছে।

অঞ্জনাকে চেনা চেনা বলেই মনে হয় পিছনের চার জনের মধ্যে এক জনের। তবু একেবারে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত না হয়ে কথা বলার জন্যে এগিয়ে যেতে সাহসে কুলোয় না। এ অবস্থায় কান পেতে রেখে সঙ্গীদের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চলা ছাড়া আর কীই বা করা যায়!

বাঃ, সূর্যমুখী ফুলের কী ছড়াছড়ি এখানটায়! আর কত বড় বড় এক একটা ফুল, দেখেছ?—রাস্তার ধারেরই একটি বাংলো প্যাটার্নের বাড়ির পাশে সুন্দর একটি ফুল-বাগান চোখে পড়তেই দাঁড়িয়ে পড়ে অঞ্জনা, শৈবালের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অপূর্ব সূর্যমুখী ফুলের দিকে। তার মনকেও সে সূর্যমুখীর মতো করে রাখতে পারবে তো চিরকাল? বিদ্যুৎ চমকের মতো এমনি একটা প্রশ্নের চিন্তা ঝিলিক দিয়ে যায় অঞ্জনার মনে। আর ঠিক তার আগের মূহূর্তে শৈবালকে শুনিয়ে শুনিয়ে যে কথা সে বলে, সে কথা ততক্ষণে অল্প দূরে অগ্রসরমান আরেক জনের কানে গিয়েও পৌঁছয়, তাঁর মনকে গিয়ে আলগোছে নাড়া দেয়। তিনি চমকে ওঠেন।

খুবই পরিচিত কণ্ঠস্বর। না, আর ভয় পাবার কিছু নেই, লজ্জারও কোনো কারণ নেই। এ স্বর অঞ্জনার না হয়ে যায় না।—একরূপ স্থিরনিশ্চয় হয়েই কয়েক পা একটু দ্রুত এগিয়ে আসেন পশ্চাতের ঐ চার জনের মধ্যে এক জন। এগিয়ে এসে একেবারে প্রায় অঞ্জনার গা ঘেঁষেই দাঁড়ান।

অঞ্জনা যে! তুমি হঠাৎ কোত্থেকে এখানে? কবে এলে?

আপনি মাস্টার মশাই! এখানেই থাকেন নাকি আজকাল?—

এই বলে টিপ করে একটা প্রণাম করে অঞ্জনা। পিঠের দিক থেকে আঁচলটা টেনে নিয়ে ঘোমটার মতো করে একটু মাথায় টেনে দেয়। দেবেই তো। তার মাস্টার মশাই যে! প্রায় পাঁচ বছর ধরে অঞ্জনা যে একটানা গান শিখেছে তাঁর কাছে! ভজন আর রবীন্দ্র সঙ্গীতের যতগুলো গান সে শিখেছে তার সব কটিই এই মাস্টার মশাইয়ের শেখানো। বিয়ের পর সাত-আট বছর বাদে এই প্রথম দেখা। বিশেষ করে বিয়ের পরে এই প্রথম দেখা বলেই অঞ্জনার এই সলজ্জভাব। নিজের অজান্তেই সে তাই কখন যে তার মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়েছে তা তার নিজেরও খেয়াল নেই।

হঠাৎ আবার অঞ্জনা কার সঙ্গে কথা বলছে? এই অচেনা অজানা জায়গায়ও কী করে আবার সে পরিচিত লোকের সন্ধান পেয়ে গেল শৈবাল বিস্মিত হয়ে তাই ভাবছে।

সূর্যমুখীর বাহার দেখে অঞ্জনা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ায় শৈবাল একটু দূরেই চলে গিয়েছিল সেই অবসরে। কিন্তু সে মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যে।

অঞ্জনাই তাড়াতাড়ি করে খুবই হাসিখুশি মনে তার মাস্টার মশাইকে নিয়ে এগিয়ে আসে। শৈবালের সঙ্গে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়।

এঁকে তোমার মনে নেই বোধ হয়। ইনিই আমার গানের মাস্টার বিনায়ক বাবু।—অঞ্জনা এই বলে থামতেই শৈবাল দু-হাত তুলে মাস্টার মশাইকে নমস্কার জানিয়ে চিন্তার ঘড়িতে একবার দম দেয়, কিন্তু কাঁটা নড়ে না। অনেক হাতড়েও সে তার স্মরণের প্রান্তরে খুঁজে পায় না বিনায়কবাবুর মতো কোনো লোককে। সেই বিয়ের সময় বিনায়কবাবুর সঙ্গে তার একবার দেখা হয়েছিল। কিন্তু তারপরে এই আট বছরের মধ্যে আর কখনো দেখাসাক্ষাৎ হয় নি এবং এমন কি কোনোদিন কোনো অবসরকালীন আলোচনাতেও তাঁর প্রসঙ্গ কখনো ওঠেনি। কাজেই অঞ্জনার সেই মাস্টার মশাইয়ের কথা শৈবালের মনে থাকবে, এমন আশা করাও ঠিক নয়।

ভবানীপুর অঞ্চলের বিখ্যাত সঙ্গীত বিদ্যালয় সুরতীর্থ। তারই প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীবিনায়ক দস্তিদার। অঞ্জনার বাবা মেয়েকে গানের স্কুলে না দিয়ে স্কুলের মাস্টারকেই বাড়িতে টিউটার করে রেখেছিলেন পাকাপাকিভাবে। স্কুলে পুরুষ শিক্ষকদের কাছে শিক্ষা-লাভে বিপদের একটা ঝুঁকিও নিতে হয়, এই আশঙ্কাতেই তিনি মেয়েকে গান শেখানোর জন্যে এমনি ব্যয়-সাপেক্ষ ব্যবস্থা করেছিলেন। বাস্তবিকই অঞ্জনার বাবাকে বেশ মোটা রকমের টাকাই খরচ করতে হয়েছে এজন্যে। তবে সেই ব্যয়ের জন্যে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই তাঁর। তার কারণ বিনায়কও সে টাকার মর্যাদা রেখেছেন তাঁর যথাসাধ্য প্রতিদান দিয়ে। আর সত্যি কথা বলতে কি, শৈবাল যে অঞ্জনাকে তার জীবনসঙ্গিনী রূপে পেয়েছে তার আসল কারণই হলো তার গানের কৃতিত্ব।

সেও এক বিচিত্র ব্যাপার। শৈবাল-অঞ্জনার বিয়ে, সত্যি সে এক অভিনব কাহিনী।

সেবার অঞ্জনাদের কলেজের পারিতোষিক বিতরণ উৎসবে সভাপতিত্ব করছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজীর প্রাক্তন অধ্যাপক মহিমারঞ্জন রায়। একটি ছাত্রীর কণ্ঠে অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী সঙ্গীত শুনে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মনে মনে একটি সিদ্ধান্তও পাকা করে ফেললেন।

দেখতে শুনতে মেয়েটি তো বেশ, আর সব দিকে যদি মিলে যায় তা হলে আমার শৈবালের জন্যে একেই আমি নিয়ে যাব আমার ঘরের লক্ষ্মী করে।—অনুষ্ঠান শেষে মনের এই কথাটিই তিনি অসঙ্কোচে কলেজ-অধ্যক্ষা মৈত্রেয়ী দেবীর কাছে খুলে বললেন এবং তাঁর কাছ থেকেই মেয়েটি সম্পর্কে নানারকম খোঁজখবর নিলেন। প্রত্যেকটি খবরই তাঁর মনের মতো।

আনন্দে প্রায় আত্মহারা হয়েই বাড়ি ফিরলেন অধ্যাপক।

ঘরে ঢুকেই চিৎকার করে ডাকলেন, ওগো শুনছ, শুনে যাও একটা মজার খবর আছে।

কী এমন আবার মজার খবর ?—গিন্নী আলনা গোছানো বন্ধ রেখে ছুটে আসেন কর্তার কাছে।

জান, তোমার ছেলের বৌ ঠিক করে এলাম। আমার শরীরের কথা তুলে তুমি যে প্রায়ই আজকাল বল, আর সভা-সমিতি করার দরকার নেই—এবার ওসব ছাড়ো ; যদি সত্যি সত্যি সভা-সমিতিতে যাওয়া একদম বন্ধ করে দিতাম তা হলে কি আর এমন সুন্দর একটি লক্ষ্মী মেয়ের খোঁজ পেতাম কখনো ?

কোথায় সে লক্ষ্মী মেয়ে, কোথায় খুঁজে পেলে তাকে ? কেমন দেখতে ?—গিন্নী অস্থির হয়ে ওঠেন জানবার জন্যে।

একটু সবুর কর না। সে কথা বলার জন্যেই তো তোমায় ডাকলাম। আগে বসতে দাও।—এই বলে প্রথমে হাতের পোর্ট-ফোলিও ব্যাগটা আর কাঁধের চাদরটা, তারপরে গা থেকে জামাটা খুলে রেখে ইজি-চেয়ারটায় আরাম করে বসলেন মহিমারঞ্জন এবং গৃহিণীকে ধীরে সুস্থে মেয়েটির সম্বন্ধে যাবতীয় বর্ণনা শোনালেন। আনন্দের আতিশয্যে সে সব বর্ণনাতেও কিছু কিছু অতিশয়োক্তি হয়তো করে ফেলেছেন তিনি, তা হলেও সেই মেয়েটিকেই তিনি শেষ পর্যন্ত পুত্রবধূ করে ঘরে নিয়ে এসেছেন এবং তাতে তাঁরা সকলেই পরম সুখী।

চৌদ্দ বছর বয়স থেকে বিয়ের আগের দিন অবধি অঞ্জনাকে গান শিখিয়েছেন আচার্য বিনায়ক। সারা অন্তর দিয়েই শিখিয়েছেন। কিন্তু কলেজে পড়ুয়া মেয়েদের মন পুরোপুরি গান-বাজনার দিকে টেনে রাখা যে খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয় তা তিনি বিশেষভাবে টের পেয়েছিলেন শেষ দুই বছরে। মা-বাবার সতর্ক দৃষ্টি সত্ত্বেও মেয়ে যেন বারবার সে পাহারার বেড়া ডিঙিয়ে বেরিয়ে পড়তে চেয়েছে। বারবারই তার চোখে ধরা পড়েছে মনের সেই চাঞ্চল্য।

এক এক বার কঠোর সংযমে তাঁকে আত্মরক্ষা করতে হয়েছে। পুরো দুটো বছর চলেছে তাঁর এইভাবে। সেই অঞ্জনা!

কত বছর পর আবার সেই অঞ্জনার সঙ্গে দেখা বিনায়কের। আই-এ-এস স্বামী পেয়েছে তাঁর ছাত্রী। তিনিও কি কম সুখী হয়েছিলেন সেদিন! কিন্তু তারপর কর্মব্যস্ত জীবনে ছাত্রীর সঙ্গে শিক্ষকের যোগাযোগ রক্ষা করা আর হয়ে ওঠে নি এবং প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই তা সম্ভব হয় না। আর এতকাল পরে যে এই সুন্দরবনে এমনি ভাবে উভয়ের দেখা হয়ে যাবে এও বাস্তবিকই অভাবনীয়।

আপনি এখানে কী মনে করে মাস্টারমশাই?—পথ চলতে চলতেই আরেকবার জিজ্ঞেস করে অঞ্জনা।

এই যে এই ভদ্রলোক নিয়ে এলেন এঁদের এখানে বেড়াতে। ইনি এখানকার একজন ডাক্তার। আমার ছেলেবেলার বন্ধু।

নমস্কার।—বিনায়কবাবুর মুখের কথা শেষ হবার আগেই অঞ্জনা তার মাস্টার মশাইয়ের বন্ধুকে করজোড়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। সঙ্গে সঙ্গেই প্রতি-নমস্কার আসে ডাক্তারের দিক থেকে। বাকি কথাটুকু তখন বলার সুযোগ নেন আচার্য বিনায়ক।

আরও দু-একটা দিন বেশিই থেকে যান না তা হলে!—ডাক্তারবাবু অনুরোধ জানান বন্ধুকে।

জান অঞ্জনা, ডাঃ দাস কলকাতা গিয়েছিলেন কদিন আগে। আমায় এবার একেবারে জোর করেই নিয়ে এলেন সঙ্গে করে। বললেন, গিয়ে দেখবেন গোসাবা ছেড়ে আর কলকাতায় ফিরতে ইচ্ছে যাবে না। সত্যি তাই। চারদিন ধরে ডাঃ দাসের বাড়িতেই আছি। দিনের পর দিন ঘুরে বেড়িয়ে কাটিয়ে দিচ্ছি। ফিরে যাবার কথা মনেই আসছে না। অথচ কাল যেতেই হবে, না গিয়ে উপায় নেই।

বা রে, আমরাও তো বেড়াতেই এসেছি। সুন্দরবন দেখার শখ আমাদের দু'জনেরই অনেকদিনের। হঠাৎ একটা সুযোগ এসে গেল। কয়েক মাস আগে উনি বদলি হয়ে এলেন সমবায় দপ্তরে। ঐ যে আগে আগে যাচ্ছেন ভদ্রলোক, অমরেশবাবু, তাঁর সঙ্গে সেই সূত্রেই ওঁর খুব আলাপ-পরিচয় হয়ে যায়। এবং তিনিই মহাসমাদরে আমাদের গোসাবা দেখাতে নিয়ে এসেছেন। সত্যি সত্যি ভারি চমৎকার লোক এই অমরেশবাবু।

আরে গোসাবার সব কিছুই তো এখন অমরেশবাবুর হাতে। জানেন না বোধ হয় অমরেশবাবুর শ্বশুর ডাঃ হালদার ছিলেন হ্যামিল্টন সাহেবের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিনি নাকি একবার গুরুতর অসুখ থেকে বাঁচিয়েছিলেন সাহেবকে। সেই থেকেই তাঁদের বন্ধুত্ব এবং অমরেশবাবুর এখানকার চাকরি ও তাঁর প্রতিপত্তি সেই বন্ধুত্বেরই ফল। আর ঐ যে দেখছেন মুন্সীবাবু, তিনি অমরেশবাবুর দক্ষিণহস্ত। ওঁদের অতিথি হয়ে যখন এসেছেন তখন কোনো অসুবিধেই তো আপনাদের হবার কথা নয়, কোনো আশাই অপূর্ণ থাকবে না।

না, ইচ্ছে থাকলেও তা সম্ভব নয়। ওঁর আবার অফিস রয়েছে তো!

ইচ্ছে পূরণের চাইতে দায়িত্ব পালনটাই বড় কথা, এ আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন ডাক্তারবাবু।—একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে আঙুলের টোকায় টোকায় সিগ্রেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে গুরুগম্ভীর স্বরে শৈবালের এই বাণী উচ্চারণের পর স্বাভাবিক ভাবেই চুপ করে যেতে হয় ডাক্তারকে।

সবাই তখন চুপ চাপ।

কিন্তু অঞ্জনা তো আর চুপ করে থাকার মেয়ে নয়। সে নীরবতাকে ভেঙে-চুরে একাকার করে দেয়।

আচ্ছা মাস্টারমশাই, আমরাও যখন কালই ফিরব, চলুন না

আমাদের সঙ্গে কাছারি বাড়িতে। বাকি সময়টুকু একত্রেই কাটানো যাবে!—বলতে বলতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে অঞ্জনা।

এদিকে মনে মনে খুবই বিরক্ত বোধ করে শৈবাল।

অমরেশবাবুর অতিথি তারা। তাঁকে না জানিয়ে, তাঁর মতামত না জেনে কী অধিকার থাকতে পারে তাদের অন্য কাউকে কাছারি বাড়িতে আমন্ত্রণ করার? আর এমনই বিপদ, আকারে ইঙ্গিতেও যে অঞ্জনাকে বারণ করা যাবে তারও কোনো উপায় নেই।

তবু রক্ষা, নিজে থেকেই মাস্টার আপত্তি জানালেন। এতে কিছুটা যেন স্বস্তির কারণ ঘটে শৈবালের পক্ষে।

তা আর কী করে হতে পারে অঞ্জনা? ডাঃ দাসের অতিথি আমি। তাঁর এবং তাঁর গৃহিণীর মত ছাড়া আমার কি আর অন্য কোথাও গিয়ে থাকা সম্ভব?—আচার্য বিনায়ক আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন এই যুক্তি দেখিয়ে। কিন্তু সব সময় কি আর যুক্তির জোর খাটে?

বেশ তো, আমিই না হয় ডাঃ দাসের অনুমতি নিয়ে নিচ্ছি।

বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলছে অঞ্জনা। বিরক্ত হয়ে সিগ্রেটের অর্ধেকটা শেষ না হতেই হঠাৎ মুখ থেকে সেটা তুলে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয় শৈবাল। চোখমুখ লাল হয়ে গেছে তার। কিছু বলতেও পারছে না, সইতেও পারছে না। রাগে টগবগ করছে তার ভেতরটা। কিন্তু সে সব তো আর চোখে পড়ছে না অঞ্জনার। তার কথা সে বলেই চলে।

শুনুন ডাঃ দাস, কত কাল পরে আজ হঠাৎ মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে দেখা। ঠিক এমনি ভাবে হঠাৎ যে তাঁর সঙ্গে এখানে দেখা হয়ে যেতে পারে তা কল্পনাও করতে পারিনি। আপনার বন্ধু তিনি, এখানে আপনার অতিথিও তিনি। আপনি যদি অমত না করেন তো মাস্টারমশাই কাছারি বাড়িতে বাকি সময়টা কাটাতে পারেন।

সে তো বেশ কথা, তাতে আমার আপত্তি করার কী থাকতে পারে?

কাছারি বাড়িও গোসাবা এস্টেটের, আমার বাড়িও। সেই হিসেবে কাছারি বাড়ির অতিথিও যা আমার অতিথিও তাই। আমি যে কাছারির ডাক্তারখানারই ডাক্তার।—এমনি ভাবেই ডাঃ দাসের অনুমতি আদায় করে নেয় অঞ্জনা।

ন্যুইসেন্স!—রাগে গজগজ করতে করতে হঠাৎ বলে ফেলে শৈবাল।

ভাগ্যি শৈবালের এই বেফাঁস কথাটা শুনতে পান নি মাস্টার। অঞ্জনাও সেদিকে কান দেয় নি। দেবার অবকাশও ছিল না। কারণ আচার্য বিনায়কের সঙ্গে কথাবার্তায়ই সে তখন মশগুল।

ঠিক সেই সময়ই কোল থেকে শিখাকে নামিয়ে দিয়েছে অঞ্জনা। শিখা মায়ের হাত ধরে ধরেই এগিয়ে চলেছে এবং মাঝে মাঝে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে তার মায়ের গানের মাস্টারকে।

এটি তোমারই খুকি বুঝি!—শিখার চিবুকে হাত দিয়ে মেয়েটিকে একটু আদর করেন আচার্য বিনায়ক।

হ্যাঁ মাস্টারমশাই, এ আমারই মেয়ে শিখা। সঙ্গে সঙ্গেই তৃপ্তির আমেজে স্নিগ্ধ এই ছোট্ট উত্তরটি আসে।

বাঃ বেশ খাসা নামটি তো! শিখার মতোই দীপ্তিময়ী হয়ে উঠুক তোমার মেয়ে।—আচার্যের এই আশীর্বাদ পেয়ে খুশিতে উচ্ছল হয়ে ওঠে অঞ্জনা। শৈবালের রাগও যেন অনেকখানি পড়ে এসেছে। তার কন্যার উদ্দেশে বর্ষিত বিনায়কের আশীর্বাণী কানে যেতেই পিছন ফিরে একবার তাকায় শৈবাল।

শিখা ততক্ষণে আচার্যের কোলে স্থান করে নিয়েছে। তা দেখে শৈবালের আরো আনন্দ।

আর এদিকে পথেরও শেষ।

কাছারি বাড়িতে ফিরতে ফিরতে বেলা প্রায় দুপুর। ক্রমাগত প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে একটানা হাঁটা। তিন-চারটে জায়গায় দু-চার মিনিটের বিশ্রাম, সে কিছুই নয়। অঞ্জনার অনভ্যস্ত পা দুখানা আর

চলছিল না। কাছারি বাড়ির সিঁড়িতে পা রেখে সে যেন তার প্রাণ ফিরে পেল! অন্তত তার গভীর দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে সে ঘোষণাই যেন ধ্বনিত।

আচার্য বিনায়ককেও কাছারি দেখাতেই নিয়ে এসেছেন ডাঃ দাস। গোসাবায় এই বাড়ি যে অন্যতম প্রধান দর্শনীয় তা কে অস্বীকার করবে? সুন্দরবনে এই সুন্দর গ্রামটিকে প্রায় শহরের মর্যাদা দিয়েছে এই কাছারি। তা কি আর বন্ধুকে ভাল করে ঘুরে ফিরে না দেখিয়ে পারেন ডাক্তার? আগে অফিসের কাজকর্ম, সাধারণ বিরোধ-মীমাংসায় এখানকার বিচারপদ্ধতি ইত্যাদি বুঝিয়ে বলার এবং সব কিছু ঘুরিয়ে দেখাবার পর বিনায়ককেও পরে নিয়ে যাওয়া হবে অতিথিশালা দেখাতে যেখানে শৈবালরা রয়েছে।

এখানে রবিবারেও কাছারি বসে। কর্তাব্যক্তিরা পুরোদমে সবাই অফিস করেন। কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংস-এর মতো গোসাবার কাছারি বাড়ি মৃতের মতো রবিবার দিন অসাড় হয়ে পড়ে থাকে না। অন্য আর সব দিনের মতোই রবিবারেও গোসাবার কাছারি সরগরম।

এ দৃশ্য কলকাতার মানুষ আচার্য বিনায়ককে স্বভাবতই একটু বিস্মিত করে। শৈবাল তো এ দেখে আরো বেশি অবাক।

'বেশি সুখের জন্যেই বেশি কাজে আমরা অভ্যস্ত করে তুলেছি এখানকার লোকদের।'—অমরেশবাবুর এ কথাটা সত্যি সত্যি ঠিক তা হলে! অতিথিশালায় যেতে যেতে শৈবালের মনের জানালায় সেই উক্তিটিই যেন উঁকি দিতে থাকে।

ওপরে উঠেই শৈবাল কিন্তু বেশ মিঠেকড়া দু-চারটে কথা শুনিয়ে দেয় অঞ্জনাকে।

এতদিনেও সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান হলো না, আশ্চর্য!—গায়ের কোটটা রাগের মাথায় ঝটাপট খুলতে খুলতে যাকে উদ্দেশ্য করে শৈবালের এই মন্তব্য সে বেচারা তো এই শুনে একেবারে হতভম্ব!

বাস্তবিকই এমন আকস্মিক আক্রমণের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল

না অঞ্জনা। এতক্ষণ ধরে এতখানি পথ হাঁটার ক্লান্তিও শৈবালের কথার উত্তর দিতে বাধা দেয় তাকে। তা ছাড়া এতটা উত্তেজনার কারণও সে ঠিক ঠিক ধরে উঠতে পারছিল না।

কী চুপ করে রইলে যে বড়!—তার মূল্যবান কথাটার উত্তর না পেয়ে যেন আর চলছে না শৈবালের। পোশাক-পরিচ্ছদ হালকা করে নিয়ে খুব গুরুগম্ভীরভাবে এবার সে পায়ের মোজা খোলবার উদ্যোগ করে।

কেন, কী এমন অন্যায় হয়েছে আমার, তা তো বুঝতে পারছি না।—খুব ধীরে ধীরে সবিনয়েই উত্তর দেয় অঞ্জনা। কাছে এগিয়ে গিয়ে স্বামীর পায়ের মোজা খুলে দেয়। এই স্বামীভক্তিটুকু পেয়ে মনটা খানিক মোলায়েম হয়ে এলেও শৈবালের মেজাজের রুক্ষতা যে তাতে সম্পূর্ণ ঘুচে গেছে তার কথার ভঙ্গিতে নিশ্চয় তা মনে করা যায় না।

তা বুঝতে পারবে কেন? তোমার বাড়িতে তোমার কোনো অতিথি যদি বাইরে থেকে অন্য অপরিচিত লোককে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসে তুমি কী ভাববে তখন? তেমন অবস্থায় কখনো পড়লে তা কি তুমি খুশি মনে মেনে নিতে পারবে, বল! তোমার মাস্টার মশাই তোমার কাছে, অমরেশবাবু তাঁকে জানেন না শোনেন না, তাঁর কাছে তাঁর কী মূল্য? কানাকড়িও না। অমরেশবাবুকে না জানিয়ে তোমার মাস্টারমশাইকে আমাদের সঙ্গে এই অতিথিশালায় থাকবার জন্যে তুমি নেমন্তন্ন করতে গেলে কোন বুদ্ধিতে আমি তো তা ভেবেই পাচ্ছি না।—বলতে বলতে শৈবালের চড়া সুরটা অবশ্য ক্রমশই যেন একটু নরম হয়ে আসে।

ও সেই কথা! তাই বল। আমি ভেবেছিলাম কি জানি কি মহা অপরাধ আবার করে বসেছি।

অপরাধ বৈ কি! একে আমি অপরাধ বলেই মনে করি।

কাল যে অমরেশবাবু বলেছিলেন তা শোন নি তুমি বুঝি? না, শুনেও ভুলে গেছ, তাই এভাবে কথা বলছ?

কী বলেছিলেন অমরেশবাবু?—শৈবাল ভাল করে জেনে নিয়ে সন্তুষ্ট হতে চায়।

আমাদের সঙ্গে আরো দু জনের আসার কথা ছিল, তোমার ভাই আর আমার ভাই। তারা আসে নি বলে অমরেশবাবু খুবই দুঃখ করছিলেন। তাদের জন্যে সমস্ত ব্যবস্থাই করে রাখা হয়েছে ওদিকের ঘরটাতে। আমি তো কাল এক ফাঁকে দেখেও এসেছি। তাই মনে হয়েছে, মাস্টারমশাই এলে আমাদের কোনো অসুবিধেই হবে না এখানে এবং অমরেশবাবুও নিশ্চয়ই খুশি হবেন।—এখানেই চুপ করে যেতে চায় অঞ্জনা। পরবর্তী পর্বের জন্যে এবার তৈরি হতে হবে তো! কিন্তু সে চুপ করতেই বাইরে থেকে হাঁকতে হাঁকতে ঘরে ঢুকে পড়েন অমরেশবাবু। সঙ্গে তাঁর মুন্সীবাবু।

কী নিয়ে আবার কথা কাটাকাটি হচ্ছে আপনাদের?—জিজ্ঞেস করেন অমরেশচন্দ্র।

না, না, ও কিছু নয়। আমাদের প্রোগ্রামের ব্যাপার নিয়েই কথা হচ্ছিল।—এই বলে প্রসঙ্গটা কোনো রকমে চাপা দিয়ে দেয় শৈবাল।

খাবারটা পাঠিয়ে দিচ্ছি তা হলে। আমার শিখাদিদির তো খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে নিশ্চয়ই। বাচ্চা মেয়ে, ওর জন্যেই আরো বেশি ভাবনা।

খেয়ে উঠেই তো আবার একটু বাদে রওনা হতে হবে সাঁওতাল পাড়ার দিকে। মাধু সাঁওতালের নেমন্তন্ন রয়েছে না, তার মেয়ের বিয়ে দেখতে যেতে হবে। ফেরার পথে আবার আমার বাড়িতে চায়ের আসরেও দু দণ্ড সময় দিতে হবে। শত হলেও আত্মীয় বাড়িতে একবার না গেলে কি চলে, কি বলেন শৈবালবাবু?—অমরেশবাবুর কথা শেষ হতেই মুন্সীবাবু গোটা কর্মসূচীটাই একবার স্মরণ করিয়ে দেন অতিথিদের।

নিশ্চয়ই, যেতে হবে বৈ কি! আপনাদের বাড়িতে নিশ্চয়ই একবার যাব।—মুন্সীবাবুর কথায় সায় দেয় শৈবাল।

হ্যাঁ, সব কিছু সেরে এসে আমরা আবার সন্ধ্যায় এখানে ফিরে গানের আসর জমিয়ে বসব। আজকের গোটা দিনটাই সত্যি সত্যি ভারি আনন্দের দিন।

হ্যাঁ, আমরা ফিরে এসেই দেখতে পাব এই ছাতের ওপরেই গানের আসরের সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়ে আছে। আপনারা চটপট তৈরি হয়ে নিন। এখনই খাবার আসবে।—মুন্সীবাবুর কথার পিঠে অমরেশবাবু এ কথাটুকু জুড়ে দিয়ে দু জনেই দ্রুত-পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসেন। মুন্সীবাবু চলে যান তাঁর নিজের বাড়িতে। খুব বেশি দূরে নয় এখান থেকে, কাছেই। বড় জোর আধমাইলটাক পথ।

ওঁরা বেরিয়ে যেতেই অঞ্জনা জিভ কাটে। ছিঃ ছিঃ, ওঁরা কী ভাবলেন বল তো!

ভাবাভাবির আর কী আছে? যা হবার তাই হয়েছে, তাই হবে। তবে পুরুষদের এটা ভুলে যাওয়া কখনোই উচিত নয় যে মেয়েদের নিয়ে আর যাই চলুক তাদের সঙ্গে কোনো কিছু নিয়েই তর্ক করা চলে না!

বেশ ভাল মানুষ তো দেখছি! তর্কটা আরম্ভ করলে তুমি, আর দোষ হয়ে গেল মেয়েমানুষদের? খুব চমৎকার যুক্তিই বটে!—অঞ্জনা চুপ করে থাকতে চাইলেও এর একটা জবাব না দিয়ে আর পারে না। পরনের ভাল শাড়িখানা ছেড়ে রেখে একখানি আট-পৌরে শাড়ি পরতে পরতে বেশ একটু খোঁচা দিয়েই সে তাই এই কথা বলে।

সত্যিই তো, সমস্ত মেয়েকে এভাবে ছোট করে দেখবে কেন শৈবাল? এযুগে কোন বিষয়ে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে পিছিয়েআছে?—উত্তর দেবার আগে এই প্রশ্নগুলো অঞ্জনার মনকে উত্তেজিতকরেছে।

তবে ইনজেকশনে কিছু কাজ হয়েছে। শৈবাল এবার ক্ষমাপ্রার্থী।

ব্যস, আমারই ঘাট হয়েছে। আমি তো স্বীকার করছি তোমার সঙ্গে তর্কে নামা আমার মোটেই ঠিক হয় নি, অন্তত তা বুদ্ধিমানের কাজ হয় নি নিশ্চয়ই।—কিন্তু এই ক্ষমা-প্রার্থনার মধ্যেও যে কিঞ্চিৎ ঝাঁজ মেশানো রয়েছে তা বেশ সহজেই বুঝে নেয় অঞ্জনা। এ তার ভাল লাগে না। সে তাই চিবুকে চেপে ধরে শাড়ির আঁচলে বুক ঢেকে নিয়ে ব্লাউজের টিপ বোতাম পটাপট ছাড়াতে ছাড়াতে বলে—থাক, এ নিয়ে রাগারাগি মাতামাতির কিছুই আর দরকার নেই। আমি সবিনয়ে আমার আমন্ত্রণ প্রত্যাহার করে নেব আমার মাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে। তাতে আমার একটুও লজ্জা পাবার কারণ নেই। তবু তুমি অন্য জায়গায় এসে এমনি অশান্তি করো না।—হাত জোড় করে মিনতি জানিয়ে গোলমালটা মিটিয়ে নিতে চায় অঞ্জনা। শাড়ির আঁচলটা দাঁতে কামড়ে ধরে ব্লাউজটা খুলে আলনায় রাখে।

এর পর শৈবালও আর কথা বাড়ায় না। হঠাৎ তার চোখে যেন দপ করে হিংস্রতার আগুন জ্বলে ওঠে। অঞ্জনা তার দাঁতে কামড়ে ধরা আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে নেবার আগেই সেটাকে চোখের নিমিষে একটানে সরিয়ে ফেলে বাথরুমে ঢুকে পড়ে সে।

আরে এস না, চট করে চলে এস। স্নান করতে করতেই না হয় আমাদের ঝগড়াটা বেশ সুন্দর করে মিটিয়ে নেওয়া যাবে।—বাথরুম থেকেই আঁচল ধরে টানতে থাকে শৈবাল।

ছিঃ ছিঃ কী যে বল, লজ্জা-সরমের মাথা খেয়েছ দেখছি! শেষটায় স্থান-কালের জ্ঞানটাও হারালে? এখনই যদি কেউ এসে পড়ে কি বিশ্রী ব্যাপার হবে বল দেখি। ছাড়ো, ছেড়ে দাও।

না, তুমি এস। কেউ আসবে না এখন, আমি বলছি।

শৈবালের সকরুণ প্রার্থনায় মুহূর্তের জন্যে এগিয়ে যেতে হয় অঞ্জনাকে। অনেক অনুনয় বিনয় ও পীড়াপীড়ি করে ছাড়া পেতে

হয় তাকে। ভয়ে আতঙ্কে বুক তার ছুরু ছুরু। কখন কে এসে পড়ে, কখন কে এসে পড়ে, এই ভয়। কেউ যে কিছু দেখে ফেলেনি তাই রক্ষে!

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে অঞ্জনা নিশ্চিন্ত।

ততক্ষণে লাল টকটকে একটা বড় আপেলকে কামড়ে কামড়ে প্রায় শেষ করে এনেছে শিখা। এ কাজে কিঞ্চিৎ শান্তি বোধ হলেও ধৈর্যের বাঁধ তার এখনো ভাঙে নি। আপেলটিকে একেবারে নিঃশেষ না করে সে যে সরে পড়বে তেমন কোন লক্ষণই নেই।

অমরেশবাবুর দেওয়া একটা রসগোল্লাও আগেই খেয়ে নিয়েছে শিখা। সত্যি সত্যিই তার বড্ড খিদে পেয়েছে যে। রসগোল্লার রসে এবং আপেলের কষে শিখার গায়ের ফ্রকটা যাচ্ছেতাই হয়ে গিয়েছে এরই মধ্যে। ভাগ্যিস বেড়িয়ে এসে ঘরে ঢুকেই সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের গা থেকে ওপরের ভাল জামাটা খুলে নিয়েছিল অঞ্জনা, তা না হলে সে জামাটা একেবারেই নষ্ট হয়ে যেত।

নে, আর খেতে হবে না। খাওয়া রেখে আয় এবার। স্নানের আর দরকার নেই, তেল মাখিয়ে গরম জলে গা-টা মুছিয়ে দি।—নিজের গায়ে পায়ে সরষের তেল মাখতে মাখতে মেয়েকে ডাকে অঞ্জনা।

মা, ছোট্ট একটা ছড়া বলব?—আপেল খেতে খেতে খুব খুশির সঙ্গে জিজ্ঞেস করে শিখা।

বেশ বল।

মায়ের অনুমতি পেয়ে শিখা আরো খুশি। সে তার বাপের শেখানো একটি ছড়াই এবার আবৃত্তি করে:

আপেলের মত মুখখানি,
চোখ যেন তার আসমানী;
হাসছে খুকু খিল খিল,
দুঃখ নেই তার এক তিল।

আপেল খাওয়া শেষ করে ফেলে খিলখিল করে হাসতে হাসতেই আবৃত্তির পর ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে শিখা।

ততক্ষণে শৈবালও স্নান সেরে এসেছে। এবার শিখা এবং অঞ্জনার পালা। সে পালা খুবই তাড়াহুড়ো করেই সারতে হয় অঞ্জনাকে। আগে মেয়ের পালা শেষ করে পরে নিজের স্নান।

অনেকটা সময় অনর্থক নষ্ট হয়েছে বাজে তর্কবিতর্কে। মনে মনে সে জন্যে আপশোস হয় অঞ্জনার। কিন্তু কী হবে আর সে সব ভেবে। মেয়েকে তো পরিপাটি করে সাজাতেই হবে। তা নইলে তার আবার মন উঠবে না। এইটুকু বাচ্চা মেয়ে হলে কী হবে, সাজ-সজ্জার বাছবিচারে বায়নার ওর অন্ত নেই। যতক্ষণ না কোনো রকমেই ওর মনে হবে যে নিখুঁতভাবে ওকে সাজানো হয়েছে ততক্ষণ কোনো রকমেই ওর মায়ের অব্যাহতি নেই। তাতেই অনেকটা সময় কেটে যায়। নিজের জন্যে মোটেই আর তেমন সময় হাতে থাকে না।

তবু বাথরুমে ভাল শাওয়ারের ব্যবস্থা ছিল বলে দু-চার মিনিটেই কোনো রকমে স্নানটা সেরে নেয় অঞ্জনা। তারপর অতি সাধারণ ভাবে সাজগোছ করে হলঘরে এসেই সে চমকে ওঠে ডাইনিং টেবিলে খাওয়ার আয়োজন দেখে।

একেই বলে বিরাট পর্ব, কি বল! পারবে তো জাস্টিস করতে? —শিখাকে নিয়ে তারই জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষমান শৈবাল প্রশ্ন করে অঞ্জনা হলঘরে এসে উপস্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গে।

রাখো তোমার রঙ্গরস। সব সমারোহই তো তোমাকে খুশি করার জন্যে। এখন তুমি জাস্টিস করতে পারলেই ওদের তৃপ্তি। আমাদের জন্যে যেটুকু দৌড়-ঝাঁপ সেও তোমারই দিকে লক্ষ্য রেখে। —অঞ্জনার এই উত্তরের পর শৈবালের আর কীই বা বলার থাকতে পারে। ওরা যে যার আসনে বসে পড়ে।

কিন্তু অমরেশবাবু কোথায়?

তিনি আজ খাচ্ছেন না আমাদের সঙ্গে। তাঁর নাকি আজ উপবাসের দিন—মায়ের মৃত্যুবার্ষিকী নাকি যেন বলছিলেন একটা! —অঞ্জনাকে জানায় শৈবাল। তাই নাকি? উপোস থেকে সারাদিন ধরে আমাদের জন্যে এইরকম দৌড়োদৌড়ি ছুটোছুটি করতে হচ্ছে ভদ্রলোককে, এ তো ভারি দুঃখের কথা!—অঞ্জনার মুখের কথা শেষ হতেই ঐ দৃশ্যমঞ্চে অমরেশবাবু এসে হাজির। সঙ্গে তাঁর আচার্য বিনায়ক দস্তিদার।

এই যে আপনাদের আরেকজন সঙ্গী বিনায়কবাবু। আমাদের আরেকজন অতিথি। পাঁচজনের আয়োজন করে রেখেছি, সাড়ে তিনজনকে পেতে দেড় দিন কেটে গেল। কাছারি দেখা শেষ হয়ে গেলে বিনায়কবাবুকে উদ্ধার করে নিয়ে এলাম ডাঃ দাসের হেফাজত থেকে। বাকি সময়টুকু উনি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। ওঁর জিনিসপত্তর ডাক্তারবাবু বিকেলে এখানে নিয়ে আসবেন।

আসুন, আসুন মাস্টারমশাই, এদিকে আসুন।—শৈবাল নিজেই দাঁড়িয়ে উঠে একখানা চেয়ার এগিয়ে দেয় এই বলে। তার এই বাইরে দেখানো আগ্রহের মধ্যে আন্তরিকতা যে কতখানি তা ঠিক প্রকাশ না পেলেও অঞ্জনা যে মোটেই বাজে কথা বলে নি, অমরেশবাবু যে বাস্তবিকই খুব আনন্দের সঙ্গে বিনায়কবাবুকে এখানে নিয়ে এসেছেন তা বুঝতে পেরে সত্যি সত্যি একটু লজ্জা বোধ করেছে শৈবাল। তাই মাস্টারমশাইকে সে এতটা সাদর অভ্যর্থনা জানায়। এ যেন অনেকটা তার পূর্বভুলের প্রায়শ্চিত্ত।

তবে সমস্ত ব্যাপারটাই অঞ্জনার কাছে স্পষ্ট। তাই মুচকি হাসির একটা প্রলেপ পড়ে তার মুখে। কিন্তু ও নিয়ে কোনো কথা না বলে অমরেশবাবুকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করে অঞ্জনা—আজ বুঝি আপনি কিছুই খাবেন না? সারাদিন উপোসে কষ্ট হবে না আপনার?

না মা, উপোসে আমার কোনোই কষ্ট হয় না। এখন বয়স হয়েছে, নিয়মপত্র মেনে চললেই বরং আজকাল একটু ভাল থাকি।

একাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যি সবই আমি মেনে চলি। আর এ তো বছরে একটা মাত্র দিন—মাকে একটু বিশেষভাবে স্মরণ করার দিন।

এর ওপর আর কীই বা বলবে অঞ্জনা! নির্বাকই থাকে সে। শৈবাল তখন অনুরোধ করে বিনায়কবাবুকে খাওয়া শুরু করার জন্যে।

নিন, এবার আরম্ভ করুন মাস্টারমশাই!

না, না, আমার ওপর অবিচার করবেন না শৈবালবাবু! একটি দানাও আর মুখে দেবার মতো ক্ষমতা নেই আমার।

এ কি বলছেন? আপনি একেবারে দেশের নাম ডোবালেন দেখছি!—এতক্ষণে নিজেকে অনেকটা সহজ করে নিয়েছে শৈবাল। কিন্তু শিল্পীকে সে তার কথার প্যাঁচে কাবু করতে পারে না।

সত্যি বলছি, এক ঘণ্টাও হয় নি ডাঃ দাসের বাড়ি থেকে পেট পুরে খেয়ে বেরিয়েছি। কথা ছিল, কাছারি বাড়ি ঘুরে-ফিরে দেখার পর ডাক্তারের সঙ্গেই তাঁর ডিস্‌পেন্সারীতে গিয়ে ঘণ্টা দুই কাটাব, তারপর দু জনে বিকেল বিকেল বেড়াতে বেরোব। কিন্তু পথে দেখা হয়ে গেল আপনাদের সঙ্গে, শেষ পর্যন্ত অমরেশবাবুর হাতে পড়ে গেলাম। এখন তাই এই কাছারি বাড়িতে বন্দী।

বেশ তো, ভালই হয়েছে। এক সঙ্গে অনেক বেড়ানো যাবে। খেয়ে উঠেই তো সাঁওতাল বাড়ির বিয়ে দেখতে যাব। ভারি মজা হবে, তাই না? আপনিও নিশ্চয়ই আমাদের মতোই সাঁওতালদের বিয়ে কখনো দেখেন নি। খুবই আনন্দ হবে। হয়তো অনেকটা হাঁটতে হবে। কাজেই আমার মনে হয় সামান্য কিছু খেয়ে নিলে ভালই করতেন।

না, রক্ষা করুন। নেহাৎ বললেন বলেই কাছে এসে বসেছি—এই বিপুল আয়োজন দেখেই আমি ভয় পেয়ে গেছি। দয়া করে আর খাওয়ার কথাটি বলবেন না।—একেবারে দু-হাত মিলিয়ে অতি সকরুণভাবে অক্ষমতা জানান আচার্য বিনায়ক।

থাক, থাক, মাস্টারমশাইকে ছেড়ে দাও। তিনি বলছেন যখন

তাঁর পক্ষে আর খাওয়া সম্ভব নয় তখন আর বারবার তাঁকে বলা কেন?—অঞ্জনা যুক্তির কথা তুলে তার কর্তাকে থামিয়ে দেয় এবং শিখাকে খাওয়ানো শুরু করে। শৈবালও চুপচাপ খেতে আরম্ভ করে।

ঠিক আছে। এখন আর পীড়াপীড়ি করা হচ্ছে না আপনাকে খাওয়ার জন্যে। তবে কলকাতা যাবার আগে আমাদের দল থেকে আর ছাড়া পাচ্ছেন না আপনি, এ যেন মনে থাকে।—বিনায়কবাবুকে লক্ষ্য করেই বললেন অমরেশবাবু।

আমার ছাড়া পাওয়া না পাওয়া এখন তো আপনাদেরই হাতে! আমার বন্ধু ডাঃ দাস এবং আপনি যা বলবেন তাই আমাকে করতে হবে। আমি তো এখন খাঁচার পাখি।

না, না, তা কেন হবেন? অঞ্জনা দেবীর আপনি গানের মাস্টার, ছাত্রীর গান শুনেই বুঝেছি মাস্টারের গান কী চমৎকার হবে। আজ সন্ধ্যায়ই এখানে গানের বৈঠক বসবে। আর ছাড়াছাড়ি নেই। শিক্ষক আর ছাত্রী দু জনেরই গান এক আসরে শুনব। এই কথা রইল।

ঠিক আছে। এ তো খুবই আনন্দের কথা।—সানন্দে সম্মতি দেন শিল্পী বিনায়ক।

আচ্ছা, এবার তা হলে এই ফাঁকে আমি নিজের কাজটুকু সেরে আসি। আপনারা যেন কোনো রকম লজ্জা করবেন না শৈবালবাবু।

না, না, আমি রয়েছি। নিশ্চিন্তে যেতে পারেন। আপনার হয়ে আমিই না হয় এঁদের দেখেশুনে খাওয়াব। কেউ ফাঁকি দিতে পারবে না।

খুবই ভাল কথা।—এই মন্তব্য করে অমরেশবাবু চলে যান তাঁর নিজের ঘরে, কিন্তু তার মাস্টারমশাইয়ের কথায় কিছুতেই আর হাসি চেপে রাখতে পারে না অঞ্জনা।

ছাতের ওপরেই ঠিক উল্টো দিকের দুখানা ঘরের মধ্যে একখানা ঘর অমরেশবাবুর জন্যে রিজার্ভ করা। গোসাবায় তিনি থাকুন

আর না-ই থাকুন, ও-ঘর তাঁর হাতছাড়া হয় না কখনো। তবে ইদানীং সপ্তাহে দু-তিন দিন করে গোসাবাতেই কাটাতে হয়। আসলে কলকাতার সঙ্গে তিনিই এখন এই হ্যামিণ্টন এস্টেটের মূল যোগসূত্র।

উপবাসে থাকলেও স্নানান্তে পুজোয় বসে অনেকটা সময় কাটান অমরেশবাবু। আজ বিশেষ করে মায়ের মৃত্যুতিথি। আরো বেশি সময় লেগে যায় তার জন্যে।

ওদের খাওয়া-দাওয়ার দায় মিটেছে অনেকক্ষণ আগেই। শোবার ঘরে যেয়ে শিখাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে নিজেও একটু গড়াগড়ি দিয়ে নিচ্ছে অঞ্জনা। আর হলঘরেই দুই ইজি-চেয়ারে দু জন গা এলিয়ে দিয়ে একই সঙ্গে বিশ্রামসুখ ও গল্পসুখ উপভোগ করছে শৈবাল আর আচার্য বিনায়ক।

শিল্পীর জীবন সংগ্রামের কাহিনী শুনে গভীর সহানুভূতিতে ভরে ওঠে শৈবালের মন। সঙ্গীতাচার্য বিনায়ক দস্তিদারের নাম কে না জানে! সরকারী গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও শৈবালের কাছেও এ নাম অনেক দিন ধরেই পরিচিত। কিন্তু নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁকে যে এত দুঃখ ও লাঞ্ছনা বরণ করতে হয়েছে, কলকাতায় এসে প্রথম জীবনে তাঁকে যে এ-বাড়ি সে-বাড়ির রকে, শেয়ালদা-হাওড়া স্টেশনে রাত কাটাতে হয়েছে, এখানে ওখানে গান শুনিয়ে দু-চার পয়সা করে নিয়ে যে তাঁকে দিনের খোরাক জোটাতে হয়েছে তার বিন্দুবিসর্গও সে জানতো না। অঞ্জনাও গত ছ-সাত বছরের মধ্যে কোনো দিন তাকে এ সম্বন্ধে কিছু বলে নি। কিন্তু সে যাই হোক, এত বিপর্যয় সত্ত্বেও এতখানি নাম-যশ অর্জন করা তো কম কথা নয়। বিনায়কবাবু সত্যি সত্যি কৃতী মানুষ, এক জন সত্যিকারের গুণী লোক।

শৈবাল এমনি ধারায় কিছুক্ষণ ধরে ভেবে চলেছিল এবং ক্রমাগত সিগ্রেট টানছিল। কি একটা কথা বলার জন্যে বাঁ দিকে চোখ

ফিরিয়েই সে দেখে মাস্টারমশাইয়ের ছু চোখ ঘুমে জড়িয়ে এসেছে। সে তাই কোনো কথা আর বলে না।

ঠিক সেই সময়েই সিঁড়ি থেকে একটা হাঁক ওঠে, কি সবাই তৈরি তো?

এ হাঁক মুন্সীবাবুর হাঁক। সে হাঁক শোনার সঙ্গে সঙ্গে সবারই চমক ভাঙে।

আচার্য বিনায়কেরও ঘুম ভেঙে যায়। অঞ্জনা চটপট উঠে পড়ে সাজতে শুরু করে। মেয়েটা আরেকটু ঘুমোক ভেবে, সে আগে থেকেই আর তাকে জাগায় না। শৈবালও হাতের সিগ্রেটের টুকরোটা বাঁ পায়ের তলায় পিষে ফেলে তৈরি হবার উদ্যোগ করে। টুকটুক করে ওপরে উঠে আসেন মুন্সীবাবু।

কিন্তু অমরেশবাবু বেরোন নি এখনো? ছুটো বেজে গেছে কিন্তু। আড়াইটার মধ্যে রওনা হতেই হবে।

এই যে আমিও উঠে পড়েছি। এক্ষুনি আসছি আমি।—শৈবালকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছিলেন মুন্সীবাবু, তার উত্তর আসে অমরেশবাবুর ঘর থেকে। তিনি দোর বন্ধ করেই স্নানান্তে নিত্যপুজোয় বসেন। অতিথি অভ্যাগত এলেও তার ব্যতিক্রম ঘটে না।

বাস্তবিকই তিন-চার মিনিটের মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে দোর খুলে বেরিয়ে আসেন অমরেশবাবু। শৈবাল এবং মাস্টারমহাশয়ও ততক্ষণে পুরোপুরি তৈরি। কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেওয়ায় শরীরটা বেশ এখন ফ্রেস লাগছে আচার্য বিনয়াকের।

অঞ্জনার দেরি কেন?—কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে শৈবাল একবার দেখতে যায় কি হলো, দেরি কেন!

অঞ্জনা সেজেগুজে আয়নায় মুখ দেখছে, আর কোথাও কোনো খুঁত রয়ে গেল কিনা তার পরখ করে চলেছে।

একবার সাজগোছ শেষ করে কেন আবার শাড়ি পাল্টাচ্ছে কে জানে! মেয়েদের ব্যাপার বুঝে ওঠা সত্যিই ছুরূহ। আর সে

সব দুরূহ ব্যাপার নিয়ে কোনো দিনই মাথা ঘামায় নি শৈবাল। তাই যে মুহূর্তে অঞ্জনা বললে, তুমি যাও আমি এক্ষুনি আসছি, সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে সে সরে আসে।

অঞ্জনা অবশ্য আর মোটেই দেরি করে না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে শিখাকে নিয়ে দলের মধ্যে হাজির এবং তাদের দলে পেয়ে সবারই সে কী উচ্ছ্বাস!

শাড়ি পাল্টাতে না হলে অঞ্জনাকে আর খোঁজ করতে হতো না। আচার্য বিনায়ক তাকে আকাশ রং-এর পোশাক পরতে দেখলে খুব তারিফ করতেন, হঠাৎ সে কথা মনে পড়ে গিয়েছিল অঞ্জনার। আর তাই এই শাড়ি পাল্টানো। তবে কী-ই বা এমন দেরি হয়েছে তাতে! মনে মনে একবার ভাবে অঞ্জনা। মাস্টারমশাই তো খুশি হবেন!

চলুন, চলুন এবার। গেটে গাড়ি তৈরি।—সবাইকে একত্র পেয়ে অরিজিৎ মুন্সী তাড়া দেন এবার।

কিন্তু ডাক্তারের যে আসবার কথা ছিল, তিনি কোথায়?—বিনায়কবাবু বন্ধুর জন্যে একটু অস্থিরতা প্রকাশ করেন।

এই যে, এই যে, বলতে বলতেই এসে পড়েছেন ডাঃ দাস!—অমরেশবাবুর চোখে পড়তেই হেঁকে ওঠেন। তাঁর দীর্ঘায়ু সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণেও তাঁর ভুল হয় না।

আচ্ছা আপনারা এগোন। বিনায়কের স্যুটকেশটা আমিই ওপরে রেখে আসছি।—এই বলে ঝড়ের বেগে কাছারি বাড়ির অতিথিশালায় উঠে গিয়ে ডাক্তার যথাস্থানে তাঁর বন্ধুর ছোট্ট স্যুটকেশটি রেখে আসেন।

গাড়ি মানে গোরুর গাড়ি। অঞ্জনা আর শিখার পক্ষে পায়ে হাঁটা আর সম্ভব নয় বুঝেই মুন্সীবাবু এবার গাড়ির ব্যবস্থা করেছেন। দুখানা গাড়ি। একখানা অতিথিদের জন্যে, অন্যখানা ওঁদের নিজেদের জন্যে।

একখানায় শৈবালদের উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ডাঃ দাস নিচে

নেমে এসে দেখেন তাঁরই জন্যে আর তিনজন অপেক্ষমান। চার জন তাঁরা এক গাড়িতেই উঠে বসেন। তাঁদের গাড়িই আগে আগে চলে। শৈবালদের গাড়ি চলে পিছে পিছে।

গোরুর গাড়ি হেলে দুলে চলে। প্রথমটায় অঞ্জনার বেশ ভয় ভয় লাগে। এক একবার চমকে চমকে ওঠে সে। মনে হয় গাড়ি উল্টে যাবে বুঝি। গোরুর গাড়িতে চড়ার এই তার প্রথম অভিজ্ঞতা। প্রথম বলেই এত ভয়। কিন্তু আসলে ভয়ের কিছুই নেই। গাড়োয়ান খুবই সতর্ক। গোরু একটু বেতাল চললেই শপাং শপাং চাবুক পড়ে তার পিঠে। আর মুখে একটা কী বিকট ধরনেরই না শব্দ করে গাড়োয়ান! ঐ শাসানিতেই গোরু দুটো আবার বেশ কিছুক্ষণ ধরে ঠিকমতো চলে।

গাড়োয়ান ঠিকই তার গোরুকে শাসিয়ে নিয়ে চলেছে। কিন্তু অঞ্জনা তার নিজের মনকে শাসনে রাখতে পারছে না কেন? শৈবাল শিখাকে কোলে নিয়ে বসেছে গাড়ির ঠিক মুখের দিকে। মেয়েকে সে এটা ওটা দেখাচ্ছে আর বুঝিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে। সতরঞ্চের নিচে খড়ের গাদা কেবলি মচমচ করছে। শিখার খুবই আমোদ লাগছে তাতে। গাড়ির চাকার একটানা ক্যাচক্যাচ শব্দটাও শিখা কান পেতে শোনে।

এ গাড়ি কিন্তু বেশ বাবা, বেশ আস্তে আস্তে চলে, কেমন সুন্দর মচমচ ক্যাচক্যাচ শব্দ করে।—শিখা ওর বাবাকে বলে।

বাপ-মেয়ের এসব আলোচনায় তখন লক্ষ্য নেই অঞ্জনার। তার মনে তখন খচমচ করছে অন্য চিন্তা। এ গাড়িতেই তো মাস্টার মশাই আসতে পারতেন। তাঁর তৃপ্তির জন্যেই আকাশ রং-এর এই শাড়ি পরা। ব্লাউজও তার সঙ্গে ম্যাচ করেই পরা হয়েছে। আর তাঁকে উঠিয়ে দেওয়া হলো আগের গাড়িতে! কেন, তিনিও তো এখানকার একজন অতিথি। অতিথিদের গাড়িতে তোলা হলো না কেন তাঁকে? অঞ্জনা এজন্যে মনে মনে চটে যায় মুন্সীবাবুর ওপর। উনিই যত নষ্টের গোড়া।

অঞ্জনার মনের এই ক্ষোভের ঢেউ-ই বুঝি সামনের গাড়িকে হঠাৎ বেশি রকম দুলিয়ে তোলে। শুধু তাই নয়, গোরু দুটো যেন আর টানতে পারছে না গাড়িটাকে। চার-চার জন গোটা গোটা জোয়ান মানুষের ওজন তো বড় কম নয়! গোরু দুটোকে মিছিমিছি অমন করে পিটলে আর কী হবে?

বিনায়কবাবুও তো আমাদের অতিথি। ওঁকে পিছনের গাড়িতে তুললেই ভাল হত।—অমরেশবাবু জোরে জোরেই এই মন্তব্যটুকু করেন আর তার রেশ অঞ্জনার কানেও যে যায় না তা নয়। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা যে ভাবনা বিনায়কের মনকেও আন্দোলিত করছিল, অমরেশবাবুও ঠিক তাই বলে ফেললেন।

গাড়ি আর চলছে না দেখে মুন্সীবাবুও বললেন, তা হলে তাই হোক, কলকাতার মানুষদের সব এক গাড়িতে তুলে নেওয়াই ভাল। আসুন বিনায়কবাবু, আপনি পিছনের গাড়িতেই এসে উঠুন।

যথানির্দেশে স্থানবদল করলেন আচার্য বিনায়ক। মনের ঝড় শান্ত হলো। একটি মনের নয়, দুটি মনের।

শৈবাল তার পাশেই জায়গা করে দেয় মাস্টারমশাইকে। ভুরভুরে এসেন্সের গন্ধ ছড়িয়ে দিয়ে অঞ্জনা শিখাকে টেনে নেয় তার কোলের কাছে। ছোঁয়া লাগতেই মাস্টার শিউরে ওঠেন।

হঠাৎ বাউল গানের সুর ভেসে আসছে কোন দিক থেকে? সুরের ঢেউ বিশেষভাবে আচার্য আর তাঁর ছাত্রীকে বেশ একটু আনমনা করে তোলে। আচার্য বিনায়ক বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখেন দূর থেকে একজন বাউল আপন মনের আনন্দে একতারা বাজিয়ে গাইতে গাইতে আসছে—

প্রেম করে সুখ হলো না প্রেমের প্রেমিক না হলে;
আখ বলে চাবালাম বাঁশ, বাঁশের নেইকো কোন রস
শুধুই কেবল গানের সর্বনাশ,
ও তুই রসগোল্লার স্বাদ কি পাবি চিটাগুড় খেলে।

কিঞ্চিৎ মধু পাবার আশায় হাত বোলালি বোল্লাচাকেতে—

শুধু বোল্লায় কামড়াইবার আসে।

ও তুই যাইবানা বধু পাইবানা মধু

শুধু বোল্লায় কামড়াবে,

গঙ্গা শানের ফল কি পাবি খালে ডুব দিলে!

এ গান নেচে নেচে গেয়ে গেয়ে আসতে আসতে বাউল হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। সুরও হারিয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। কিন্তু ভাবান্তর কাটিয়ে উঠতে বিনায়ক দস্তিদারের আরেকটু সময় লাগে।

ছুখানা গাড়িই সেই থেকে বেশ সুন্দর চলেছে। স্বাভাবিক গতি। নিরুদ্বেগে পথ অতিক্রম। কতটুকু পথই বা আর বাকি ছিল!

তবু যেটুকু পথ একত্রে চলা গেল সেটুকুই মন্দের ভাল। শেষ পর্যন্ত খুব শান্তিতেই আসা গেল তো! শিক্ষক ছাত্রী একত্রে এবং একটি সুন্দর গান শুনতে শুনতে! দেখতে দেখতে গাড়ি এসে পড়ে সাঁওতাল পাড়ায়।

সাঁওতাল পাড়ার মুখেই মাধু সাঁওতালের ঘর। মাধব মুণ্ডারই আজ মেয়ের বিয়ে। তার বাড়ির উঠোনে তাই এতো ভিড়, এতো জটলা। মাধব মুণ্ডাকেই গোসাবার লোকেরা বলে মাধু সাঁওতাল। এই নামেই সে ছেলেবুড়ো সবার কাছে পরিচিত।

॥ চার ॥

মাদলের তালে তালে নাচ চলেছে তখন। মাধুর মেয়ের বিয়ে উপলক্ষেই এই নৃত্য উৎসব। সঙ্গীদেরসহ সস্ত্রীক শৈবালকে নিয়ে নাচের আসরে বিশেষ সম্মানের আসনেই বসানো হলো।

বর আসবার সময় যতই এগিয়ে আসছে নাচের ধুম ততই বেড়ে চলেছে। শিখা অবাক হয়ে চেয়ে আছে সেই নাচের দিকে। অঞ্জনারও এমন সাঁওতালি নাচ দেখবার সুযোগ কোনোদিন তো এর আগে আর হয় নি, এ নাচের অভিনবত্ব তাই ওদের এতটা মুগ্ধ করেছে।

শৈবালও যে কম উপভোগ করছে তা নয়। মাদলের বাজনা ও নাচের তাল তার ওপরে এমন মোহ বিস্তার করেছে যে সেই থেকে সেও নির্বাক।

আর আচার্য বিনায়কের কথা তো কিছু বলারই নেই—গানের জগতের মানুষ তিনি, এই নৃত্যোৎসবে তাই তিনি একেবারে আত্মহারা!

হঠাৎ একটা রব উঠল 'ঐ বর আসছে, ঐ বর আসছে' বলে। নাচের ধুমও চড়ে উঠল চরমে। ছেলে-ছোকরাদের এক দল আর মেয়েরা অনেকেই ছুটে গেল সেদিকে। নাচ চলতেই থাকল।

বরের শোভাযাত্রা সেই নাচের আসরেই এসে ঢুকল।

কাচের চুড়ি, রূপোর গয়না ও ফুলের গয়নায় সুসজ্জিতা কনে। তার দু পাশে মঙ্গলঘট-মাথায় আরো দুটি মেয়ে। মিলন মাঙ্গলিকের এই হলো প্রধান চিহ্ন। বরণডালার অনুষ্ঠান আগেই হয়ে গিয়েছে। কনেকে বসিয়ে রাখা হয়েছে এতক্ষণ ধরে বরের অপেক্ষায়।

বর তার নিজের বাড়িতে সব রকমের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সেরে সগৌরবে বিয়ে করতে এসেছে শোভাযাত্রা করে। সেই শোভাযাত্রারই

পুরোভাগে বীরবেশী বর উল্টো-দিক থেকে আসরে ঢুকতেই একেবারে কনের সঙ্গে মুখোমুখি। আর সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক থেকে আনন্দোল্লাস। নাচের আসর এবার সত্যিকারের বিয়ের আসরে রূপান্তরিত।

বর আর কনে। ছু জনের হাতেই একটি করে আম্রপল্লবের ডাল।

অঞ্জনা দেখছে আর ভাবছে, আমাদের প্রথার সঙ্গে সাঁওতালদের বিয়ের রীতিনীতিরও দেখছি অনেক মিল। বিস্ময় তার আরো বেড়ে যায় বর-কনেকে আসরের মাঝখানে এসে পাঁচ পাক ঘুরতে দেখে। তারা ঘুরছে আর পরস্পর পরস্পরকে আম্রপল্লবের মৃত্যু আঘাত হানছে। পড়শীরা জল ছিটোচ্ছে।

তার জীবনেও এমনি একটি বিশেষ দিন এসেছিল। অঞ্জনার মনে পড়ে যায় সেই দিনের কথা এবং তখনকার নানা ছবি তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

মাদলের বাজনা থেমেছে। নাচও থেমে আছে কিছুক্ষণ ধরে। সেই অবকাশেই কিছু কিছু গল্পসল্প চলেছে উপস্থিত সকলের মধ্যে।

কী হে, কেমন লাগছে মাস্টার? একেবারেই নিষ্পলক নিস্তব্ধ হয়ে আছো যে!—ডাক্তার-বন্ধুই প্রথমে মুখ খুলে জিজ্ঞেস করেন আচার্য বিনায়ককে। তারপরে সেই সূত্র ধরেই অতিথিশালার দলটির মধ্যে আলোচনা বেশ জমে ওঠে।

এদিকে কিছুক্ষণ কাটতেই হঠাৎ আনন্দধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা আসর।

হঠাৎ কী হলো? কিসের এত উল্লাস?—জানতে চায় শৈবাল। গল্পে গল্পে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সে।

বা রে দেখলে না বুঝি, কনের মাথায় সিঁতুর পরিয়ে দিলে যে বর। তার জন্যেই এত হাততালি, এত আনন্দ। সঙ্গে সঙ্গে আবার বাজনারও শুরু।—কর্তার প্রশ্নের উত্তর দেয় অঞ্জনা।

আর ঠিক তক্ষুনি এক পাশ থেকে মাধু সাঁওতাল ছুটে এসে

একেবারে শৈবালের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। কৃতাঞ্জলিপুটে সকলের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে নবদম্পতির জন্যে। শৈবালকে ভাল করে বুঝিয়ে বলে,জানলি হুজুর, এতেক আমার ছাওয়াল যুধিষ্ঠিরের বৌ হইলো।

বলতে বলতে চোখ জোড়া ছল ছল করে ওঠে মাধু সাঁওতালের। কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে সে আরেক দিকে চলে যায়। বাজনার সঙ্গে সঙ্গে আবার নাচ আরম্ভ হয়ে গেছে ততক্ষণে।

আমাদের কিন্তু আর বেশিক্ষণ দেরি করা ঠিক হবে না।

হ্যাঁ, কাছারি বাড়িতে হয়তো অনেকেই ধীরে ধীরে এসে জড়ো হয়ে যাবেন আমাদের পৌঁছনোর আগেই। দেখি, মাধুকে বলে বিদায় নেবার উদ্যোগ করা যাক তা হলে।—অরিজিৎ মুন্সীর তাগিদে এই বলে আসন ছেড়ে উঠে পড়েন অমরেশবাবু।

তাঁকে উঠতে দেখে অঞ্জনা যেন আপত্তি করে। বলে, সে কি, এখুনি উঠছেন যে! আরো কত কি হয়তো মজার মজার জিনিস দেখার আছে।

তা ঠিকই আছে। তবে তার অনেকগুলোই আমাদের স্ত্রী-আচারের মতো। একটু বাদেই বর-কনেকে পুকুরে নিয়ে যাওয়া হবে। কনেকে না দেখিয়ে একটি মঙ্গলকলস জলে ডুবিয়ে রাখবে বর আর কনেকে তা খুঁজে বার করতে হবে। আবার কনেও তা পুকুরের কোথাও লুকিয়ে রাখবে আর সেই লুকানো কলস বর খুঁজে খুঁজে উদ্ধার করে আনবে। এমনি সব ব্যাপার চলবে অনেকক্ষণ ধরে। সে সব আর কী দেখবেন মা?—অমরেশবাবুর এ কথার ওপর আর কিছু বলতে ভরসা পায় না অঞ্জনা। তবে তার চোখে-মুখে একটা বেজার ভাব সহজেই নজরে পড়ে।

সেই বেজার ভাব লক্ষ্য করেই অমরেশবাবু আবার বলেন, আপনার গান শোনার জন্যে যারা এসে কাছারি বাড়িতে জড়ো হবেন,

আপনাকে না পেয়ে তাঁদের যদি ফিরে যেতে হয় তা হলে সেটা কত দুঃখের হবে, বলুন তো মা! তা ছাড়া আবার আপনার মাস্টার মশাইয়ের গান শোনারও একটা সুযোগ পেয়ে গেছি। সে সুযোগ কি ছাড়তে পারি, মা?

সাত-আট বছর পর আবার মাস্টারমশাই-এর গান শুনব, সে কি আমার কাছেও কম আনন্দের বিষয়, অমরেশবাবু!—অঞ্জনার চোখের তারা যেন খুশিতে ঝিকমিক করে ওঠে এ উত্তর দিতে গিয়ে। একটু থেমে নিয়ে আবার সে বলে, বেশ, ফেরবার ব্যবস্থাই এবার করুন তা হলে।

মাধু দূর থেকে দেখতে পেয়েছে, অমরেশবাবু উঠে পড়েছেন। তাঁর অন্যান্য সঙ্গীরাও উঠব উঠব করছেন। ছুটে এসে গলবস্ত্র হয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ে বিশিষ্ট অতিথিদের সামনে।

কোনো আমন্ত্রিত লোক অভুক্ত অবস্থায় বিয়ে-বাড়ি থেকে চলে যাবে এ হতেই পারে না। অমরেশবাবু এবং অরিজিৎবাবুর কোনো যুক্তিই কাবু করতে পারে না মাধবকে। এই সব ভদ্রলোকরা তার বাড়ি থেকে একেবারে কিছু মুখে না দিয়ে চলে গেলে সাঁওতালদের আতিথেয়তার দুর্নাম হবে না, আর তার জন্যে তো সবাই তাকেই দায়ী করবে—সোজা সরল মানুষ হলেও এটুকু বুঝবার মতো বুদ্ধি মাধু সাঁওতালের আছে। সে তাই পায়ে পড়ে পড়ে সকলকে রাজী করায় একটু কিছু খেয়ে যাবার জন্যে।

একটি ছোট্ট চালাঘরে মাধু নিজেই অতিথিদের নিয়ে যায়। শৈবালদের জন্যে খাবারদাবারের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে সেই ঘরেই।

মাধু এক একটি কথা বলে আর ভুর ভুর তাড়ির গন্ধ ভেসে আসে। তবু কিন্তু মোটেই মাতাল হয় নি মাধু। সব দিকেই তার লক্ষ্য ঠিক আছে। বিয়ের কাজ ঠিক মতো হচ্ছে কিনা সেদিকে যেমনি, আবার অতিথি-অভ্যাগতের আপ্যায়নের দিকেও তার প্রখর দৃষ্টি।

এতে অবাক লেগেছে শৈবালের। বিয়ের আসরেও অনেককেই সে দেখেছে, চোখ তাদের ঢুলু ঢুলু—যেন জোড়া জোড়া সব রক্ত-গোলাপ। শিখা এবং অঞ্জনাকে নিয়ে সে এসেছে সাঁওতাল বাড়ির বিয়ে দেখতে, কিন্তু এই মাতাল আবহাওয়ায় হঠাৎ যদি একটা গণ্ডগোল বেধে যায় তা হলেই মুশকিল। এই রকম একটা ভয়ই বারবার উঁকি দিচ্ছিল শৈবালের মনে। তবে অমরেশবাবুরা সবাই রয়েছেন, এ ভরসাও ছিল। যাই হোক ভালয় ভালয় সময়টা কেটে গেল, এবার নিশ্চিন্ত।

ভদ্রলোক অতিথিদের জন্যে খাওয়ার বিচিত্র আয়োজন করেছে মাধু সাঁওতাল। প্রত্যেকের সামনে এক পাতা করে ফল আর মিঠাই এবং এক গ্লাস করে দুধ। খুবই পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা। আর মাধুর এমনি অনুরোধের জোর যে কম হোক বেশি হোক সবাইকেই কিছু না কিছু খেতেই হলো।

বিদায় নেবার আগে অঞ্জনাকে কানে কানে গিয়ে কী যেন বললে শৈবাল।

অঞ্জনা গাড়িতে ওঠবার আগে মাধুর হাতে দশ টাকার একটি নোট গুঁজে দিলে। তাকে বুঝিয়ে বললে তার মেয়ের জন্যে এ তার আশীর্বাদ, এ টাকা দিয়ে সে যেন তার মেয়েকে পছন্দমতো একখানা শাড়ি কিনে দেয়।

নোটটা হাতে পড়তেই খুশিতে যেন গলে যায় মাধু সাঁওতাল। গড় হয়ে অঞ্জনাকে পেন্নাম করে। এবং তার পরে এক এক করে বাবুদেরও।

ডাক্তারবাবু একটু অন্যমনস্ক ছিলেন সে সময়টা। তাঁর চোখ গিয়ে পড়েছিল পাশের কুয়োতলার দিকে। এক সাঁওতালী যুবতী বৌ সারাদিনের খাটাখাটনির পর মনের আনন্দে স্নান করছিল প্রায় উদাম হয়ে। আড়াল আবডালের কোনো ধার ধারেনা ওরা। মাথার ওপর বালতির পর বালতি জল ঢেলে চলেছিল যুবতী বৌ।

তার কালো মিশমিশে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেয়ে সেই জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছিল, আর গোটা শরীর জুড়ে রূপোর মতো ঝিকমিক করছিল সেই সব জলধারা। সেই রূপালী জলে ভেজা কালো দেহের এদিক-সেদিকে গিয়ে পিছলে পিছলে পড়ছিল ডাক্তারের দৃষ্টি। তাঁর ক্ষণিকের অন্যমনস্কতার সেই কারণ।

পায়ে তাঁর মাধুর হাত পড়তেই ডাক্তারবাবু চমকে ওঠেন। ভয়, দলের কেউ আবার ধরে ফেল্লে নাকি ব্যাপারটা। তা ছাড়া সাঁওতাল পাড়ায় এসে অসামাজিক আচরণের দায়ে পড়লে সেটা তাঁর পক্ষে একটা গুরুতর কলঙ্কের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে বৈকি। এই তো মাত্র কমাস হলো তিনি গোসাবায় ডাক্তার হয়ে এসেছেন।

না, সে সব কিছু নয়, মাধু সাঁওতাল বিদায় নিচ্ছে তাদের সবার কাছ থেকে, এটা বুঝতে পেরে ডাক্তার নিশ্চিন্ত।

আবার তোরা আসবি হুজুর। আবার আসবি কিন্তু।—গাড়ি ছেড়ে দিতেই হাত তুলে জোর গলায় হেঁকে হেঁকে বলে মাধু সাঁওতাল। গাড়ি দুটি অদৃশ্য হয়ে গেলে তবেই সে ঘরে ফিরে আসে।

এবার গাড়িতে কিছুটা অদলবদল করা হয়েছে যাত্রীদের। শৈবালের প্রস্তাব মতোই তা করা হয়েছে। শৈবালের জায়গায় অমরেশবাবু এসেছেন, মুন্সীবাবুদের গাড়িতে গিয়েছে শৈবাল।

এ ব্যবস্থায় ভালই হয়েছে। সাঁওতালদের সম্বন্ধে, গোসাবার অন্যান্য নানা বিষয়ে নানা তথ্য অমরেশবাবু বুঝিয়ে চলেছেন অঞ্জনাকে, বিনায়কবাবুকে এবং সময় সময় শিখারও হঠাৎ হঠাৎ দু-একটা প্রশ্নের জবাব তাঁকে দিতে হচ্ছে। আর অন্য গাড়িতে রয়েছেন পাকা ওস্তাদ মুন্সীবাবু—শৈবালের প্রত্যেকটি জিজ্ঞাসার উত্তর তাঁর একেবারে ঠোঁটের ওপর।

ওঁকে বলেছিলাম সম্ভব হলে আরেকটা দিন বেশি থেকে যেতে।

তা হলে বিয়ের উৎসবটা পুরো দেখে আসা যেত। সত্যি সত্যি ভারি ভাল লাগছিল।

কিন্তু শৈবালবাবু কিছুতেই রাজী হলেন না, তাই তো ?—গাড়ি চলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই অঞ্জনার আপশোসকে আরেকটু তাতিয়ে দেন অমরেশবাবু।

না, কিছুতেই তাঁর মত আদায় করা গেল না। যাক গে, কী আর করা যাবে ? তবে কতকগুলো ব্যাপার আমার খুব জানতে ইচ্ছে।

কী, কী বলুন ?

সাঁওতালদের বিয়ের কথাই ধরুন। ওদের সব বিয়েই কি এমনি ভাবেই হয়ে থাকে নাকি ?

ঠিক তা বলা চলে না। তবে মোটামুটি ধরনটা বোধ হয় সব জায়গার সাঁওতালদের মধ্যেই একরকম। তা হলেও এই একটি কথা জেনে রাখবেন মা, যুগের হাওয়া ওদের গায়েও গিয়ে লেগেছে। এপারের ঢেউ ওপারের মাটি ধ্বসে ফেলছে। সভ্যতার রথ ওদের সততা সরলতা ইত্যাদি গুণগুলোকে চুরিয়ে গুঁড়িয়ে এগিয়ে চলেছে।

তাই তো দেখছি। ছোটবেলা বইপত্রে সাঁওতালদের সম্বন্ধে যেসব কথা পড়েছি তার সঙ্গে অনেক কিছুরই যেন মিল পেলাম না এখানে। সভ্য জগতের মানুষদের সঙ্গে মিলে মিশে ওরা বোধ হয় অনেকটা পাল্টে গেছে।

শুধু কি তাই মা, ওই যে কী যেন লভ ম্যারেজ বলে একটা কথা খুব আজকাল চালু হয়েছে, এই সাঁওতালদের মধ্যেও হালে দেখছি সে রকম বিয়ে খুব জোর চলেছে।—অমরেশবাবুর এ কথায় অঞ্জনা বোধ হয় লজ্জায়ই একটু মুখ ঘুরিয়ে নেয়। তবে সেই সুযোগে মুখ খোলেন আচার্য বিনায়ক।

কেমন, কেমন ?—খুব আগ্রহের সঙ্গেই জিজ্ঞেস করেন মাস্টার মশাই।

তা হলে শুনুন, এই অল্প কিছুদিন আগেরই একটি ঘটনার কথা বলছি। ঐ আমাদের মহাদেব মাঝির ছেলে সহদেবের বিয়ে নিয়েই বেশ একটা সোরগোল পড়ে গিয়েছিল সাঁওতাল পাড়ায়।

তাই বুঝি? ভেরি ইণ্টারেস্টিং।—ঔৎসুক্য বেড়ে ওঠে বিনায়কবাবুর সে কাহিনী শোনবার জন্যে। আর চুপ করে থাকলেও অঞ্জনাও তার দু কান খাড়া করে রাখে সেই দিকেই।

অমরেশবাবু বলে চলেছেন, মহাদেবেরই প্রতিবেশী ভীম সাঁওতালের মেয়ে সোনা। লুকিয়ে লুকিয়ে এই মেয়েটার সঙ্গে সহদেব ছোঁড়াটা ভাব জমিয়ে চলেছিল অনেকদিন ধরেই। সোনাকে নিয়ে পালিয়ে যাবারই সে মতলব এঁটেছিল। অনেকবারই মেয়েটার কাছে সে ঐ প্রস্তাব পেড়েছিল। সোনা ভয় পেয়েছে, রাজী হয় নি। তখন আর কী করবে সহদেব? আর সহ্য করতে না পেরে এর একটা ফয়সলা করে ফেলার জন্যে সহদেব একদিন সরাসরি একেবারে ভীমের বাড়িতে গিয়ে হাজির। তখন বাড়িতেই ছিল ভীম দাস, তার স্ত্রী আর সোনা মেয়েটাও। ভীম আর তার স্ত্রীর সামনেই সোনাকে কাছে টেনে নিয়ে ছোঁড়াটা সোজাসুজি বলে দিলে, তাদের মেয়েকে ও বিয়ে করবে।

উরে বাপস্, কী দুঃসাহস ঐ সহদেব ছেলেটার?—মন্তব্য করেন বিনায়কবাবু।

ঠিকই বলেছেন, কিন্তু কাপুরুষেরা কি আর বাঞ্ছিতাকে লাভ করতে পারে মাস্টারমশাই, তবে এক্ষেত্রে এ দুঃসাহসের একটা অবশ্য কারণও আছে। গোসাবার সাঁওতালদের মধ্যে মহাদেব মাঝিই সব চেয়ে সচ্ছল অবস্থার লোক। তাকে আর সবাই একটু মান্যগণ্যও করে, ভয়ডরও পায়। তারই সুযোগ নিয়েছে ছোকরা। কিন্তু তাহলেও ছাড়াছাড়ি নেই, বেআইনী ভাবে কোনো মেয়ের গায়ে হাত দিলেই সাজা পেতে হয় ওদের মধ্যে। মেয়েটা ছুটে পালিয়ে যেতেই ওর বাপ রেগে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই যেয়ে নালিশ করে দিয়ে

আসে ওদের পঞ্চায়েতের কাছে। সহদেব আর সোনা দু জনকেই পঞ্চায়েতের কাছে হাজির করা হলো। প্রথমেই সহদেব স্বীকার পেল সোনার গায়ে সে হাত দিয়েছে। এই জন্যে এক জোড়া চাষের বলদ তাকে দিতে হবে, এই তার শাস্তি হলো। তার পর বিয়ের প্রশ্ন নিয়ে বিচার আরম্ভ হলো। কিন্তু জেরার পর জেরা করে যখন জানা গেল যে সোনাও সহদেবকেই বিয়ে করতে চায় তখন পঞ্চায়েত আর কী করবে! তবে গোপনে গোপনে এ বিয়ের ব্যবস্থা করায় ছেলেটাকে আরেক দফা জরিমানা দিতে হবে সাব্যস্ত হলো। আর ঐ পঁচাত্তর টাকা জরিমানা ভীম সাঁওতালের হাতে গুনে গুনে দিয়েই সোনাকে বৌ করে নতুন সংসার পেতে বসে সহদেব।

অমরেশবাবুর মুখে এই কাহিনী শুনে অঞ্জনা এবং আচার্য বিনায়ক উভয়েরই বুকের ভেতরটায় খচমচ করে ওঠে। পুরোনো দিনের কতগুলো স্মৃতি হুড়মুড় করে চলে যায় তাদের চোখের সামনে দিয়ে।

কিছুক্ষণ ধরে অমরেশবাবুদের গাড়িতে সবাই চুপচাপ।

হঠাৎ মায়ের কোল থেকে লাফিয়ে উঠে শিখা চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে, বড় বড় ঐ পাখিগুলো কি পাখি মা—মাঠের মধ্যে ওগুলো ওখানে কি করছে বল না?

মেয়ের আব্দারে মা গলে যায় যেন। কিন্তু কোথায় কী দেখাচ্ছে শিখা? অঞ্জনার কিছু চোখেই পড়ে না। সে সোজাসুজি রাস্তা বরাবর দেখছিল, তাই চোখে পড়েনি।

এই যে ডান দিকে ছাখো না, ঐ তো মাঠের মধ্যে কী যেন খাচ্ছে!—এবার থুতনি ধরে টেনে ঠিক দিকে মায়ের মুখ ঘুরিয়ে দেয় শিখা।

ওগুলো শকুন। গোরু কি মোষ মরেছে, তাই খাচ্ছে। ওরা অমনি করেই দল বেঁধে মরা গোরু-ভেড়া এসব খায়। থাক, ওদিকে আর তাকাতে নেই মা। বড্ড ঘেন্না!—রুমালে নাক ঢেকে এ কটি কথা বলে মেয়েকে আবার কোলে টেনে বসিয়ে নেয় অঞ্জনা।

শিখারও খুব ঘেন্না লাগে। এ্যা মা, কি বিশ্রী পাখি ওগুলো—মরা খায়!—এই বলে শিখা ওর ফ্রক তুলে ঘেন্নায় নাক ঢাকে। চোখ ফিরিয়ে নেয় অন্য দিকে।

আবার কিছুদূর যেতেই আরেকটা নতুন প্রশ্ন হঠাৎ নাড়া দেয় শিখার মনকে। নতুন কিছু চোখে পড়লেই সে তা বুঝে নেবার জন্যে চঞ্চল হয়ে ওঠে। এখানেও তাই।

ঐ ছাখো মা, লম্বা লম্বা গাছগুলোর কাঁধের ওপর কেমন করে দাঁড়িয়ে ক'টা লোক যেন কি করছে। ওরা অমন করছে কেন মা?—শিখার এই আকস্মিক প্রশ্নে পথের ধারের খেজুর গাছগুলোর মাথার দিকে তাকাতে হয় অঞ্জনাকে। আর অমনি তার ছোটবেলার গ্রাম-জীবনের কথা মনে পড়ে যায়। তার মেয়ে এর আগে কখনো গ্রামই দেখে নি, কী করে সে জানবে কোনটা কি গাছ এবং খেজুর গাছ থেকে কী করে রস আসে। গাছের সঙ্গে কোমরে দড়ি এঁটে অমনি করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খুব ধারালো দা দিয়ে গাছের ছাল চেঁছে চেঁছে একটা ছোট্ট পাইপ বসিয়ে দেওয়া হয় সেখানে এবং সেই পাইপের মুখে একটা মেটে কলসী বা হাঁড়ি ঝুলিয়ে রাখা হয় সারা রাত ধরে। ফোঁটা-ফোঁটা রস পড়ে পড়ে ভোর বেলার মধ্যে কলসী একেবারে ভরে থাকে। সে রস কাঁচা খাওয়া চলে, তাতে সুন্দর পায়েস হয় আরো কতো কি!· অঞ্জনা সব বুঝিয়ে বলে শিখাকে। তাকে আরো জানায়, এখনকার নয় পৌষ মাসের খেজুর রসের স্বাদই সবচেয়ে ভাল।

অমরেশবাবুর গল্প শেষ হবার পর আর একটি কথাও বলেন নি আচার্য বিনায়ক। সহদেবের কাহিনীই তাঁর মনকে সম্পূর্ণ অধিকার করেছিল। বাঞ্ছিতাকে পেতে হলে দুঃসাহসী হওয়া দরকার, পৌরুষের প্রয়োজন—অমরেশবাবুর এ যুক্তি তাঁর মনে কেবলি ঘুরপাক খাচ্ছিল।

সে সময় আরেকখানা গোরুরগাড়িও কথার তরঙ্গ-দোলায় দুলতে দুলতেই অমরেশবাবুদের অনুসরণ করে চলছিল। কথায় মুন্সীবাবুর

জুড়ি গোসাবায় নেই। কাজেই তাঁর সঙ্গী হওয়া একদিক থেকে শৈবালের পক্ষে ভালই হয়েছে। কোনো কোনো বিষয়ে একটু আধটু বাড়িয়ে চড়িয়ে বললেও তাতে এমন কিছু এসে যায় না। কিছুটা ছাঁটকাট করে নিলেও তথ্যের যোগফলটা মোটামুটি বেশ একটা বড় অঙ্কেরই রূপ নেবে। নানা বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জেনে যাওয়াটাই যে শৈবালের লক্ষ্য।

ডাঃ দাসের কাছ থেকেও গোসাবার লোকদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে, তাদের চিকিৎসা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে এবং স্থানীয় জলবায়ু ইত্যাদি বিষয়ে কিছু কিছু সংবাদ সংগ্রহের সুযোগ নেয় শৈবাল। তবে মুন্সীবাবুর একারই বলার কথা এত বেশি যে, অন্য কারো কথা বলার তেমন ফুরসুতই হয় না।

ফিরতি পথে এ গাড়িতেও প্রথম সাঁওতালদের প্রসঙ্গ নিয়েই আলোচনা আরম্ভ হয়েছিল। ওদের সহজ সরল আনন্দময় জীবনের পিছনে যে দুঃখ-বেদনার ইতিহাস চাপা পড়ে আছে সে কথাটাই শৈবাল তুলেছিল।

টুক করে তার সেই মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মুন্সীবাবু সঙ্গে সঙ্গেই বলতে লেগে গেলেন সাঁওতালদের দুঃখের দীর্ঘ ইতিহাসের কথা।

ঠিকই বলেছেন আপনি শৈবালবাবু, সুন্দরবনের সাঁওতালদের দুঃখের অন্ত নেই। সুন্দরবনের এখানে ওখানে যত সাঁওতাল ছড়ানো রয়েছে, বিশেষ করে কালিন্দী নদী বরাবর এলাকার লক্ষাধিক আদিবাসী সাঁওতাল আজ যেমন ভূমিহারা সর্বহারা ভিখারী-জীবন যাপন করছে, আগে তাদের এরূপ শোচনীয় অবস্থা ছিল না। জমিদার শ্রেণী এবং তাদের নায়েব-গোমস্তাদের চক্রান্ত ও কৌশলেরই ফল এসব। নিরীহ সাঁওতাল ও আর সব দরিদ্র মানুষকে নানা-ভাবে ঠকিয়ে সর্বস্বান্ত করেই তো তারা জমিদারীর পর জমিদারী বাড়িয়ে এবং বাড়ির পর বাড়ি করে চলেছে।

শৈবাল কোনোরকম সাড়া-শব্দ না করে একমনে শুনে চলেছে। মুন্সীবাবু অনর্গল বলে চলেছেন।

আপনি নিশ্চয় একটি ঘটনার বিষয় জানেন শৈবালবাবু, জানেন বলছি এজন্যে যে এতদিনে নিশ্চয়ই আপনি আপনার দপ্তরের নথিপত্র দেখে থাকবেন। খুবই হালের ঘটনা কিনা তাই রেকর্ডের মধ্যে আপনার তা চোখে পড়ার কথা।

অত ভূমিকা না করে ব্যাপারটা কি তাই বলুন না!—এবার আর কিছু না বলে থাকতে পারে না শৈবাল। এবং একটু কড়া সুরেই বলে।

হ্যাঁ, গত বছরের সেই ঘটনার কথাই বলছি। আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরের একজন আর আমাদের সমবায় দপ্তরের একজন, এই দুই অফিসার একই সঙ্গে এসেছিলেন সেবার সুন্দরবন সফরে। প্রায় আট-দশ দিন তাঁরা কাটিয়ে গেছেন সুন্দরবনের নানা অঞ্চল ঘুরে ঘুরে। সব শেষে তাঁরা এসেছিলেন গোসাবায়। এখানেই তাঁরা কথায় কথায় বলছিলেন, আদিবাসী সমাজ সর্বত্রই পিছিয়ে আছে সত্যি কথা, কিন্তু সুন্দরবনের সাঁওতালদের দুঃখের সঙ্গে পশ্চিম বাংলার আর কোনো জায়গার আদিবাসীদের দুর্দশার তুলনা করা চলে না।

তাই না কি, এ রকম কথা বলেছিলেন ওঁরা?—শৈবাল প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, আমি নিজে শুনেছি তাঁদের সে কথা বলতে। এবং সে রকম রিপোর্টও নাকি তাঁরা সরকারের কাছে পেশ করেছিলেন। আর সাঁওতালদের সংখ্যা তো বড় কম নয় সুন্দরবনে।' আমাদের এই সন্দেশখালি থানারই একটা ইউনিয়নের প্রায় পনেরো হাজার লোকের মধ্যে অন্তত এগারো হাজারই সাঁওতাল। আর এসব সাঁওতালদের কী দুর্দশা সে আর কী বলব শৈবালবাবু! টাকার লোভ দেখিয়ে জমির লোভ দেখিয়ে উত্তর বাংলা থেকে, সাঁওতাল-পরগণা থেকে, বিহার-উড়িষ্যার নানা জায়গা থেকে এদেরই বাপ-

ঠাকুর্দাদের দলে দলে নিয়ে এসে যারা জঙ্গল সাফ করিয়ে আজ এক-এক জন জমিদার, তাদের এতটুকু দুঃখু নেই এই নিরীহ মানুষগুলোর জন্যে ; বরং এই দুঃখী মানুষগুলোর ওপর যখন-তখন মারধর নির্যাতন চালাতেই যেন জমিদারের লোকজনরা এখনো আনন্দ পায়।

হুঁ, তবে মাত্রার উনিশ-বিশ থাকলেও এখানে এই গোসাবাতেও যে গরীবের ওপর কোনো পীড়ন-নির্যাতন চলে না তেমন কথা তো নিশ্চয়ই বলা চলে না।—শৈবালের এই মন্তব্য শুনেই হকচকিয়ে ওঠেন মুন্সীবাবু।

না-না, গোসাবার অবস্থা অন্যরকম। সুন্দরবনের অন্য সব এলাকার তুলনায় এখানকার সাঁওতালরা অনেক সুখে অনেক বেশি আনন্দে আছে সে তো আপনি দেখেই এলেন।

থাক, থাক, এ নিয়ে আর আলোচনার দরকার নেই। আপনার বাড়ি আর কদ্দূর তাই বলুন। সন্ধ্যে তো হয়ে এল প্রায়।

ঐ তো, আরেকটু এগুলেই আমার বাড়ি।

আরে গোসাবায় ট্রাক্টরও এসে গেছে দেখছি!—রাস্তার পাশেই একটা মাঠে ট্রাক্টর চলতে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে শৈবাল।

কিন্তু এতে এতটা অবাক হবার কী আছে শৈবালবাবু! সুন্দরবনে সভ্যতার উপকরণের যত কিছু আমদানি তার সবই তো এই গোসাবা থেকেই শুরু। ট্রাক্টরের চাষও এখানেই প্রথম আরম্ভ হয়েছে, ধীরে ধীরে সারা সুন্দরবনেই তা চালু হয়ে যাবে। আপনার জানা আছে কিনা ঠিক জানি না, এই গোসাবার চাষীদের অবস্থা চিন্তা করতে করতেই স্যার ড্যানিয়েল এ সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে কোটি কোটি ভারতীয় কৃষকের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে হলে এক টাকার নোট চালু করা প্রয়োজন। আজ যে এদেশে এই এক টাকার নোট দেখছেন তা কিন্তু স্যার ড্যানিয়েলের মাধ্যমে প্রকারান্তরে গোসাবারই চাপের ফল। তাই বলছিলাম সুন্দরবন কোনো দিক থেকেই উপেক্ষণীয়

ময়। এবং এ কথাও বলতে পারি, সরকার যদি সুন্দরবনের দিকে একটু তাড়াতাড়ি নজর দেন সুন্দরবনের অফুরন্ত সম্পদের পরিচয় পেতে খুব বেশি দেরি হবে না।—এই বলে খুব একটা উজ্জ্বল আশার চিত্র মুন্সীবাবু তুলে ধরেন শৈবালবাবুর সামনে। গাড়ি দুটোও সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়িয়ে পড়ে।

আরে আরে, আমরা যে এসে গিয়েছি! কথায় কথায় আমার খেয়ালই ছিল না কিছু। নামুন, নামুন এবার শৈবালবাবু। ডাক্তারবাবুর চোখ লেগে এসেছিল যেন একটু!—বলেই হুড়মুড় করে আগে গাড়ি থেকে নেমে পড়েন মুন্সীবাবু। তার পরে হাত ধরে নামান ডাক্তারবাবুকে এবং শৈবালবাবুকে।

অঞ্জনাদের নিয়ে অমরেশবাবু আগেই গাড়ি থেকে নেমেছেন। মুন্সীবাবুর বাড়ির মেয়েরা অঞ্জনা এবং শিখাকে এরই মধ্যে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে ঘরে নিয়ে যাবার জন্যে।

শিখাকে কোলে নেবার জন্যে মুন্সীবাবুর বড় মেয়ে কঙ্কার সে কী চেষ্টা! কিন্তু কিছুতেই তার কোলে যাবে না সে। তার মাকে সে জাপটে ধরে থাকে। তার পর বাপ এসে যেই বলে, চল চল, তখন তার কোলে চেপেই মুন্সীবাবুদের ঘরে গিয়ে সে চুপটি করে বসে পড়ে বাবা ও মায়ের মাঝখানে।

আত্মীয়ের অভ্যর্থনায় বেশি সময় কিন্তু আপনাকে নিতে দেওয়া হবে না অরিজিৎবাবু।—আগে থেকেই সতর্ক করে দেন অমরেশচন্দ্র।

না, মোটেই সময় নেব না, সেদিকে আমার বেশ খেয়াল আছে। চা-ও তৈরি। কাজেই দেরি হবার কোনো কারণও নেই।—মুন্সীবাবুর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই তাঁর মেয়েরা সব হাতে হাতে পিঠের বাটি আর চা নিয়ে এসে হাজির।

সে কি, এখনো তো পৌষ মাসের অনেক বাকি। কথায়ই বলে পৌষ-পিঠে। কিন্তু আপনারা দেখছি এখনই পিঠের মহোৎসব শুরু করে দিয়েছেন।—ডাক্তারবাবু চমকে ওঠেন বাটি বাটি পিঠে-পায়েস দেখে।

ডাঃ দাস কী যে বলেন, পৌষ না আসলে পিঠে খাওয়া চলবে না এমন তো কোনো বিধি-নিষেধ নেই। বিশেষ করে আমরা বাঙাল মানুষ শীতের আমেজ আরম্ভ হতেই আমাদের পিঠে-পায়েসেরও মরসুম শুরু হয়ে যায়। তবে অবশ্যি তার পুরো ধুম পড়ে পৌষ-সংক্রান্তিতে, সে কথা ঠিক।

ঠিক বলেছেন মুন্সীবাবু, ঐ ঠিক সাঁওতালদের টুসু উৎসবের মতো দাঁড়িয়ে গেল ব্যাপারটা। টুসুর আসল উৎসব হল পৌষ-সংক্রান্তিতে। কিন্তু তার মহড়া আরম্ভ হয়ে গেছে সেই কবে থেকে। একটু কান খাড়া রাখলেই যখন তখন যেখানে সেখানেই আজকাল টুসুর গান শুনতে পাওয়া যায়। এও অনেকটা তারই মতো, কী বলেন মুন্সীবাবু?

কথাটা হয়তো ঠিকই বলেছেন আপনি, কিন্তু সাঁওতালদের সঙ্গে বাঙালদের এই তুলনাটায় আমার আপত্তি।—মুন্সীবাবুকে উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়ে ডাঃ দাস আগে থেকেই ফোঁড়ন কেটে বসেন।

যাক গে, ওসব কথা থাক এখন। আরম্ভ করুন।—সময় যে আর নষ্ট করা চলে না সে খেয়াল তাঁর আছে বলেই মুন্সীবাবু আর তর্কে নামতে চান না। তা ছাড়া তাঁর বাঙালত্বের গৌরবের জন্যে অমরেশবাবু প্রভৃতির কাছে তাঁকে প্রায়ই এমনি খোঁচা সহ্য করতে হয়। তাই এখন আর এসব কথায় তেমন ভ্রূক্ষেপও তাঁর নেই।

কিন্তু আপনার এখানে যে আয়োজন দেখছি তাতে আরম্ভের আগেই সমাপ্তি ঘোষণা বোধ হয় বাঞ্ছনীয়।—শৈবাল এতক্ষণে মুখ খোলে। এই সময়টুকুর মধ্যে বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় সেরে নিতে হয়েছে কিনা ওদের দু জনকে, তাই এদিকের আলোচনায় আর তেমনভাবে যোগ দিতে পারে নি ওরা।

আত্মীয় হয়ে এমনি অনাত্মীয়ের মতো কথা বলছেন আপনি শৈবালবাবু, এ ভারি দুঃখের বিষয় কিন্তু!—বাস্তবিকই অরিজিৎবাবুর

কালো মুখখানা যেন আরো ঘন কালিমায় ছেয়ে যায় শৈবালের ঐ মন্তব্যের উত্তর দিতে গিয়ে। বাড়ির আর সবাইও গম্ভীর হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। অবস্থা বুঝতে পেরে শৈবালও সঙ্গে সঙ্গেই ভ্রম সংশোধন করে নেয়।

সে বলে, আমি যা বলেছি তাতে দুঃখ পাবার কিছু নেই। আমার বলবার কথা, বিয়ে-বাড়ি থেকে একদফা খেয়ে আসা হলো, তার পরে এখানে আবার যদি এত খেতে হয় তা হলে আর গানের আসর বসানো চলবে না। বলুন মাস্টারমশাই, আপনি তো ওস্তাদ মানুষ, এ খাওয়ার পর গান গাইতে রাজী হবেন আপনি? আর আপনি অমত করলে আপনার ছাত্রীর সম্মতি যে কিছুতেই মিলবে না সে তো জানা কথা। কি বলেন?

তা যা হয় হবে' খন। গান গাওয়ার যত অসুবিধেই হোক, ইনি যখন আপনাদের জন্যেই এ আয়োজন করেছেন তাঁকে তো খুশি করতেই হবে।

খুবই খাঁটি কথা বলেছেন মাস্টারমশাই। যা হোক একটু কিছু করে সবাই যদি খেয়ে নেন তা হলে মুন্সীবাবুও তৃপ্ত হবেন আর বাড়ির মেয়েদের মেহানতও সার্থক হবে।—আবহাওয়াটা আবার বেশ শান্ত হয়ে আসে মাস্টারমশাই আর অমরেশবাবুর কথায়।

বেশ, চা-টা তো আমি খাবই, তার সঙ্গে একখানা লুচিও খাচ্ছি। দয়া করে তার পরে আর আমায় কোনো অনুরোধ করবেন না মুন্সীবাবু।—শৈবাল এই বলে চুমুক দেয় তার চায়ের কাপে।

এই অবসরে আমার কিন্তু একটা কথা খুব জানতে ইচ্ছে হচ্ছে অমরেশবাবু!

কী বলুন তো?—অঞ্জনাকে জিজ্ঞেস করেন অমরেশবাবু।

ঐ যে আপনি টুসু গানের কথা বলছিলেন, ও কি রকম গান তা আমি জানি নে। তার সম্বন্ধেই কিছু জানতে চাইছিলাম।

বলুন না মুন্সীবাবু, টুসুর ব্যাপারটা অঞ্জনা দেবীকে একটু বুঝিয়ে

বলুন। আর আপনার তো বোধ হয় অনেক টুসু গান মুখস্থই আছে, তারও দু-একটা শুনিয়ে দিন না। ওঁদের খাওয়া হতে হতে।

বেশ কথা, টুসুর ব্যাপারটা আমি বুঝিয়ে বলছি। তবে এক-আধটা গানের পদ মনে থাকলেও টুসুর কোনো পুরো গানই আমার মুখস্থ নেই। আমার ছোট মেয়ে লক্ষ্মী না হয় তার একটা শুনিয়ে দেবে। কৈ রে লক্ষ্মী মা, এদিকে আয় দেখি। অঞ্জনা দেবীকে একটা টুসুর গান শুনিয়ে যা।—বাপ লক্ষ্মীর নাম উচ্চারণ করতেই লজ্জায় সে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই তার দিদিরা তাকে ধরে এনে হাজির করেছে সভার মাঝখানে।

মুন্সীবাবু বুঝিয়ে বললেন, আদিবাসীদের শ্রেষ্ঠ দেবতা টুসু মা। এই টুসু মাকে কেন্দ্র করে আদিবাসীরা সর্বত্র তাদের পৌষ পরব করে থাকে। সুন্দরবনের সাঁওতালরাও পৌষ আসবার আগেই এই উৎসবে মেতে ওঠে। নতুন নতুন কত গান তারা তৈরি করে এই উপলক্ষে। নাচ-গান, তীর-ধনুক খেলা আরো কত হৈ-হল্লার মধ্যে ওরা পৌষ-সংক্রান্তিতে টুসু মায়ের পূজার উৎসব শেষ করে মহা সমারোহে। নিজেদের দুঃখ মোচনের জন্যে দেবতাদের বন্দনা, টুসু মায়ের কাছে ওদের প্রার্থনার অন্ত নেই। এবার লক্ষ্মী মা, তুমি এঁদের শুনিয়ে দাও দেখি তোমার ঐ সন্ধ্যাতারার ছোট্ট টুসু গানটা।

লজ্জায় মাথা নিচু করে থাকে লক্ষ্মী। শেষটায় বাপের তাগিদে, দিদিদের তাড়ায় চোখ নামিয়ে রেখেই তরতর করে কোনো রকমে একবার আউরে যায় গানটা :

"সাঁঝ দিলাম শলিতা দিলাম
স্বর্গে দিলাম বাতি গো।
সকল দেবতা সঞ্জা লেও মা
লক্ষ্মী সরস্বতী গো।
সাক্ষী রাখি সঞ্জা তারা,

তুমি যদি ঠিক হও মা তারা,
ফিরে এস হয়ে ভরের তারা,
আদিবাসীদের ঘরে আশীর্বাদ কর গো।"

আবৃত্তির সুরে এটুকু বলেই লক্ষ্মী একেবারে চোখের পলকে কোথায় দে-ছুট! তাকে আর কে পায়।

বাবাটা যে কী! মনে মনে ভারি চটে যায় নয়-দশ বছরের মেয়ে লক্ষ্মী। সে আর কাছে আসে না। কে জানে আবার যদি এমনি কিছু একটা হুকুম করে বসে বাবা, সেই ভয়।

এদিকে লুচি খাওয়া, পিঠে খাওয়া, চা পান যাঁর যেমন রুচি, যেমন ইচ্ছে—সব শেষ। অমরেশবাবুর তো উপোস, তাঁর কোনো ঝামেলাই নেই। তিনিই উঠে দাঁড়ান সবার আগে।

এবার চলুন তা হলে। নতুন গুড়ের পিঠে-পায়েসের গন্ধে আমারও যে তৃপ্তি বড় কম হলো তা নয়। উপোস করলেও তার ফলটা আমার মুন্সীবাবুই বোধ হয় মাটি করে দিলেন। কারণ তাঁর এখানে এসে ঘ্রাণেন অর্ধভোজনং বাস্তবিকই আমার হয়ে গেছে, এ অস্বীকার করার উপায় নেই।—বলতে বলতে বাইরে নেমে আসেন অমরেশবাবু এবং তাঁর পিছে পিছে আর সবাই। সাজানো পান ভর্তি ডিবে হাতে করে সবার শেষে আসেন মুন্সীবাবু।

গোরুরগাড়িতে আর সাত-আট মিনিটের পথ কাছারিবাড়ি। প্রায় ঠিক সময়মত গিয়েই পৌঁছনো যাবে। এক আধটুকু দেরি যা হবে তা মোটে ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। আমি একটু মায়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে যাই। আপনি এবার পিছনের গাড়িতেই আসুন অমরেশবাবু।—মুন্সীবাবুর ব্যবস্থা মতোই যাত্রী সাজানো হয় গাড়িতে এবং গাড়ি যাত্রা শুরু করে।

কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর মুখ ঢাকা পড়ে আসছে অন্ধকারের অবগুণ্ঠনে। অঞ্জনার ভয় ভয় লাগে। বাতি থাকে না এই গোরুরগাড়িতে?—জিজ্ঞেস করে সে।

থাকে বৈকি! আরে ও রাখহরি, তাড়াতাড়ি লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে দে রে। অঞ্জনা মা যে ভয় পাচ্ছেন!—মুন্সীবাবু ডাকতেই লণ্ঠনের কুপিতেই দেশলাই ধরিয়ে দিতে যায় গাড়োয়ান রাখহরি। বাতিটা ধরতে ধরতে বাতাসে বারবার নিভে নিভে যাচ্ছিল। ভয়টা তাতে আরো যেন জমাট হয়ে উঠছিল। হঠাৎ কুপিটা জ্বলতেই শেষ অবধি সোয়াস্তি!

গাড়ির মধ্যে অন্ধকারে কার হাতের ছোঁয়া যেন লাগছিল অঞ্জনার গায়ে। বোধহয় মাস্টার মশায়েরই। প্রথমটায় সে বুঝতে পারে নি। বুঝতে পারে নি বলেই কথাটা তুলেছিল অঞ্জনা। মাস্টারমশাই যে তার পাশেই বসেছিল সেটাই সে আগে লক্ষ্য করে নি। তার জন্যেই এত গোলমাল। আলোর জন্যে তার হাঁকডাক শুনে মাস্টারমশাই আবার কী ভাবলেন সেও আরেক ভাবনা অঞ্জনার।

শিখাও যে তার মাকে অমনভাবে জড়িয়ে বসেছিল সেও তো ভয়ে ভয়েই। অন্ধকারে কোনো ভূত এসে কিংবা কোনো দস্যু-ডাকাত এসে তার মাকে না নিয়ে নেয়, তাকে না নিয়ে নেয় সেই ভয়।

লণ্ঠনের বাতি জ্বলতেই শিখা সোজা হয়ে বসে। তার মাও এবার যেন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত।

আচার্য বিনায়ক তখন রহস্য করেই বোধ হয় বললেন, এবার ভয়-ভাবনা সব দূর হয়েছে তো!

না, ভয় আবার কিসের? আমাদের নিজেদের গাড়ি। আমরা এতগুলো লোক চলেছি একসঙ্গে। তা ছাড়া আমাদের গোসাবায় আমরা আবার কাকে ভয় পাব? দেখছেন না আরেকটা গাড়িতে এখনো অবধি লণ্ঠন জ্বালাবার কথা ওদের মনেই আসে নি!—ভয়-ডরের ব্যাপারটাকে এমনিভাবে এক তুড়িতে উড়িয়ে দেন মুন্সীবাবু। তার পরে একটু থেমে আবার বলেন, আর এসেই তো গেলুম দেখতে

দেখতে। ঐ তো আমাদের কাছারি বাড়ির ছাতের বিজলী আলো দেখা যাচ্ছে।

বলতেই অঞ্জনা, শিখা, বিনায়কবাবু সবাই হুমড়ি খেয়ে মুখ বাড়িয়ে কাছারি বাড়ির সেই আলো দেখার চেষ্টা করে। সে আলো গাড়ির সমুখ দিক থেকে সবারই চোখে পড়ে, কিন্তু তা দেখতে গিয়ে মাস্টার আর ছাত্রীর গায়ে গায়ে আবার ছোঁয়াছুঁয়ি ঘটে যায়। আকস্মিক হলেও আকাঙ্ক্ষিত বলেই বোধ হয় এই ঘনিষ্টতায় উভয়তই একটা তৃপ্তির ভাব।

বাস্তবিকই এবার কিন্তু তার জন্যে একটি কথাও বলে না অঞ্জনা। যেন কিছুই ঘটে নি। তেমনি ভাবেই চুপ করে থাকে। এমন কি মাস্টারমশাইয়ের হাতের ছোট্ট চাপটিও এবার আর তার মুখ ফোটাতে পারে না।

বরং বেশ কিছু বাদে অঞ্জনা যে কথা বলে সে অন্য কথা। সে বলে, শুধু কাছারি বাড়ির কেন, এখন তো চারদিকেই আলো দেখছি অরিজিৎবাবু। সবদিকেই আলোর আনন্দ।

আমরা এবার গোসাবা শহরেই এসে পড়েছি যে!—চারদিকের আলোর রহস্যটা এই ভাবে বুঝিয়ে দেন মুন্সীবাবু। অন্যদিকে মাস্টার মশাই কিন্তু অঞ্জনার কথার আরো একটা মানে বার করে নিয়ে মনে মনে অত্যন্ত খুশি হয়ে ওঠেন।

কাছারির দুয়ারে এসে গাড়ি থামে। একটার পর আরেকটাও এসে থামে। অমরেশবাবুদের গাড়িতে লণ্ঠন মোটে জ্বালানোই হয় নি। অন্ধকারে বসে বসেই কথায় কথায় ওঁরা আলোর রাজ্যে এসে পড়েছেন।

॥ পাঁচ ॥

কাছারি বাড়ির ওপরে নীচে তখন অনেক লোকজনের ভিড়।

গানের আসর বসবে, কলকাতার গাইয়েদের গান শোনা যাবে, তারই জন্যে ধীরে ধীরে এত লোক এসে জড়ো হয়েছে এখানে।

ছাতে উঠে আসর-ভর্তি লোক দেখে অঞ্জনা তো অবাক। এক বেলার মধ্যে এত বিরাট আয়োজন কি ভাবে সম্ভব হলো সেইটা তার প্রশ্ন।

বা রে, সন্ধ্যায় আপনার গান হবে কাছারি বাড়িতে, আজ সকালেই তো ঢোল সহরৎ সারা গোসাবায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিকেলেও আরেকবার ঢোল পেটানোর ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন অমরেশবাবু, আপনার গুরু আচার্য বিনায়কও গাইবেন তা জানাবার জন্যে। তাও নিশ্চয়ই সময় মতো ঘোষণা করা হয়েছে। তারপরেও দলে দলে এসে লোক জড় হবে না, সে কি হতে পারে?

ও, তাই এত ভিড়! আমার মাস্টার মশাইয়ের গান শুনলে সত্যি সত্যি সবাই বুঝতে পারবে গান মানুষকে কতটা আনন্দ দিতে পারে।—ডাক্তার দাসের কথার পিঠে এই মন্তব্য করে নিজেদের শোবার ঘরে চলে যায় অঞ্জনা শিখাকে সঙ্গে নিয়ে। ওদের তৈরি হয়ে আসতে আসতে শৈবাল ততক্ষণ হলঘরের আরাম কেদারায় একটু গা মোড়ামুড়ি দিয়ে নেয় বিনায়কবাবু ও ডাক্তার দাসের সঙ্গে গল্প করতে করতে।

অনেক মাতব্বর গোছের লোককেই যেন দেখলাম আসরে!—শৈবালই একটা সিগ্রেট ধরিয়ে ধূমপানে নিয়াসক্ত ডাঃ দাস ও আচার্য বিনায়কের সামনে সিগ্রেটের কৌটো এগিয়ে ধরতে ধরতে প্রথম কথা আরম্ভ করে।

হ্যাঁ, কোনো কর্তা-ব্যক্তিই বোধ হয় বাকি নেই। তবে এখানে রোববারেও তো কাছারি বসে। অফিসাররা প্রায় সবাই একবার করে কাছারিতে আসেন, ফাইলপত্তর নাড়াচাড়া করেন। কাজ জমে গিয়ে থাকলে কিছু কিছু সেরেও যান। আজও তাই হয়েছে। আজকের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। কর্তারা আজ হয়তো অফিসের কাজকর্ম তাড়াহুড়ো করে সেরে যে যার বাড়ি চলে গিয়েছিলেন, আবার সাজ-পোশাক বদলে এক এক করে সবাই ফিরে এসেছেন গান শোনবার জন্যে। ঐ দেখুন, তাঁদেরই সব তদারক করতে লেগে গিয়েছেন অমরেশবাবু আর মুন্সীবাবু।—হলঘরে এসেই ছাতের বিধি-ব্যবস্থার দিকে শৈবালের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ডাঃ দাস।

আপনি বোধ হয় যাকে বলে পুরোপুরি চেন-স্মোকার, তাই না শৈবালবাবু? —হঠাৎ দুম করে এমনি একটা প্রশ্ন করে বসে নিজে থেকেই থমকে যান আচার্য বিনায়ক। তাঁর নিজেরই মনে হয় এরূপ প্রশ্ন তোলা ঠিক হয় নি তাঁর পক্ষে। শত হলেও শ্বশুর জামাতা সম্পর্ক তো বটেই?

হ্যাঁ, চাকরি জীবনে এ একটা মস্ত বদ অভ্যেস করে ফেলেছি মাস্টারমশাই। আর এখন এর হাত থেকে নিস্তার পাবারও কোনো উপায় আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু আপনি কি করে জানলেন যে আমি একজন পুরোপুরি চেন-স্মোকার?

না, ঠিক জানা বলা চলে না একে, অনুমান করছিলাম।

কি ভাবে?—সিগ্রেটের পোড়া অংশ এ্যাসট্রেতে ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে আবার প্রশ্ন করে শৈবাল।

আজকের এই একটি মাত্র দিনের কথা হলেও কোনো সময়ই আপনাকে সিগ্রেটছাড়া অবস্থায় দেখি নি কিনা তাই।

একবারে অবিরাম সাইকেল চালনা প্রতিযোগিতার মতোই অবিরাম ধূম্রপান প্রতিযোগিতা! কিংবা ঐ রকমের একটা কিছুর মতো, কি বল?—এই বলে বন্ধুর সঙ্গে কিঞ্চিৎ রসিকতা করেন ডাঃ দাস।

তবে আমি কোনো অভ্যেসকেই বদ অভ্যেস বলে মনে করি নে কিন্তু শৈবালবাবু! আমার এই আকস্মিক প্রশ্নের জন্যে আপনি কিছু মনে করবেন না যেন।—অনুরোধ জানান মাস্টারমশাই। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই নতুন সাজে এসে শিখাকে নিয়ে তার মা হাজির।

চলুন এবার তা হলে আসরে যাওয়া যাক। সবাই উদগ্রাব হয়ে বসে আছে। সাড়ে পাঁচটা সময় দেওয়া ছিল, এখন ছটা বেজে আট।—ঘড়ি দেখে উঠে পড়েন ডাঃ দাস এবং সবাইকে নিয়ে গানের আসরে এসে বসেন।

তার পরে শুধু গান, গান আর গান!

কাল শৈবালের এত অনুরোধেও কোনো গানই যেন মনে আসছিল না অঞ্জনার। গলার স্বর যেন কেবলই আটকে আটকে যাচ্ছিল গাইবার কথা ভাবতে গিয়ে। নেহাৎ অমরেশবাবু কী মনে করবেন, তাই ভেবেই শেষ অবধি তাকে অবিশ্যি কোনো রকমে একটা গান গাইতে হয়েছে মোটর লঞ্চে বসে সুবিস্তৃত নদী-সঙ্গমের মুক্ত পরিবেশে। কিন্তু অমরেশবাবু তাকে যত বাহবাই দিন না কেন, তার গানের যত প্রশংসাই করুন না কেন, কালকের গানে-অঞ্জনা নিজে মোটেই খুশি হতে পারে নি এবং তার জন্যেই শৈবালের ওপর সে অমন রেগে গিয়েছিল জোর করে তাকে গান গাওয়ানোয়। কাল রাত অবধি যে তার জের চলেছে শৈবালেরও তা ভোলবার কথা নয়।

কিন্তু আজ যেন গানের বান ডেকেছে অঞ্জনার মনের সমুদ্রে। পাঁচ বছর ধরে যত গান সে শিখেছে আচার্য বিনায়কের কাছে তার সবগুলোই যেন একই সঙ্গে সুরাশ্রিত হয়ে প্রবল স্রোতবেগে ভেসে আসতে চায় তার কণ্ঠে। সত্যিসত্যি বহুদিন বাদে সে এমনি উন্মাদনা অনুভব করছে গানের আসরে বসে।

কিছুক্ষণের জন্যে নিজের মধ্যেই যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলে অঞ্জনা।

হঠাৎ তার চোখ পড়ে উন্মুখ শ্রোতাদের দিকে। তার গান শোনবার জন্যেই তো এরা সব অধীর হয়ে আছে। তাকে চুপ করে থাকলে চলবে কেন? খেয়াল হতেই আলগোছে হারমোনিয়ামটাকে কাছে টেনে নিয়ে সুর বাঁধতে সে লেগে যায় তবলার সঙ্গে।

এখানকারই লোক তবলচী। একজন পুরোনো বাজিয়ে, গুণী লোক। সুর বাঁধতে গিয়েই অঞ্জনা টের পেয়েছে গান খুব ভালই জমবে এঁর সঙ্গতে। আচার্যের মনও তাতে বেশ উল্লসিত।

'সাধন কর্‌না চাহিয়ে মনয়া ভজন কর্‌না চাই। প্রেম লাগান চাহিয়ে মনয়া প্রীত করনা চাই।'—মীরার এই ভজন দিয়ে শুরু করে পরপর অনেকগুলো গানই গেয়ে ফেলে অঞ্জনা। কোনো দ্বিধা নেই, কোনো শ্রান্তি বা কষ্টবোধও যেন নেই তার।

এক একটি গানের শেষে প্রচুর হাততালি শেষ হতেই আসর আবার স্তব্ধ নির্বাক। এক একখানা নতুন গান আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি শ্রোতাই যেন একেবারে সমাধিস্থ। ছোট-বড়র মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, এমনি অবস্থা। বাস্তবিকই সবাই পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে অঞ্জনার গান শুনে।

আনন্দে উচ্ছল হয়ে ওঠেন আচার্য। এতদিনের ব্যবধানেও বিস্মৃতির বালুচরে যে অঞ্জনার সুরতরঙ্গ একেবারেই চাপা পড়ে যায় নি, সেজন্যেই আরো বেশি আনন্দ তাঁর। অঞ্জনা সারা অন্তর দিয়েই গ্রহণ করেছিল তাঁর শিক্ষাকে এই তার প্রমাণ। আর এই নতুন পরিবেশে সেই কথা ভাবতে গিয়ে অভিভূত হয়ে পড়েন তিনি।

শৈবালেরও খুশির অন্ত নেই। সে ভাবে অঞ্জনার আজকের এ সাফল্যের অনেকখানি কৃতিত্বই তার প্রাপ্য। শিখাকে কোলে বসিয়ে বাপ-মেয়ে দু জনে তার গান শুনছিল। আনন্দের আতিশয্যে শৈবাল যে এক একবার তার মেয়েকে আদরে আদরে অস্থির করে তুলছিল সেদিকে মাঝে মাঝে চোখ পড়ছিল অঞ্জনার এবং তার হাসিও পাচ্ছিল।

শৈবাল ভাবছিল, কাল সে অনেক হাঙ্গামা করে অঞ্জনার লজ্জার বাঁধ ভেঙ্গে দিয়েছিল বলেই না আজ তার পক্ষে এমনি গলা ছেড়ে গেয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

কিন্তু যে যা ভাবে ভাবুক, আন্তর্যামী জানেন আর জানে অঞ্জনা কোন্ প্রেরণা রয়েছে তার আজকের সাফল্যের মূলে।

ওস্তাদজী নিজে আর কোনো গান গাইতে চান না অঞ্জনার গানের পর।

আমার গানই তো সার্থক রূপ পেয়েছে অঞ্জনার সুরে। তার পরেও আবার আমায় কেন অনুরোধ করছেন আপনারা?—আচার্য নিষ্কৃতি পেতে চান এই যুক্তি দেখিয়ে।

কিন্তু নিস্তার পাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না তাঁর পক্ষে। অন্তত দুখানা গান গেয়ে তবে তাঁর অব্যাহতি।

সবার সমবেত তাগিদ বিশেষ করে শৈবাল আর অমরেশবাবুর পীড়াপীড়িতে ওস্তাদজী যখন গান ধরলেন সভা তখন আবার নীরব নিস্তব্ধ। নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের বুকে একটি অপূর্ব সুর-ধ্বনি যেন আপনাকে বিছিয়ে চলেছে অতি সন্তর্পণে। কারো মুখে টুঁ শব্দটি নেই। সভার সব শ্রোতারা নিষ্পলক নিশ্চল মূর্তি যেন এক একটি।

আচার্য বিনায়কের কণ্ঠে তুলসীদাসের 'মনোয়া ভজনে সীতারাম' গানের পর কখন যে রবীন্দ্রনাথের 'দিন যার ক্লান্ত হল তার লাগি কি এনেছ বর, জানাক তা তব মৃদু স্বর' গানটি আরম্ভ এবং শেষ হয়ে গেল, সেদিকে কোনো খেয়ালই ছিল না শ্রোতাদের।

আচার্যের অপূর্ব সুর-মূর্ছনায় এবং গান দুটির গভীর আবেদনে বাস্তবিকই সবাই যেন আবিষ্ট ও আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল বেশ কিছুক্ষণের জন্যে।

তার পর আসর যখন ভাঙল সারা দিনের ক্লান্তিতে তখন দলের প্রায় সবারই ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম।

কিন্তু তবুও ছাড়া পাবার উপায় নেই। অতিথিদের জন্যে একটি

অ্যাভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে সেখানে একবার না গেলে কি চলে! খাওয়াদাওয়া সেরে কোনো রকমে গিয়ে কষ্টেসৃষ্টে কয়েকটি দৃশ্য দেখে আসতে হবে।

অমরেশবাবু কিন্তু তখনো পর্যন্ত উপবাসে তেমন কাবু হন নি এবং তিনিই শৈবালকে বলেছেন, যে নাটকটি এখানে অভিনীত হবে তার নাট্যকার স্বয়ং এখানকার হেড মাস্টারমশাই। এক-কালের ইতিহাসের অধ্যাপক তিনি সুন্দরবনবাসীদের সামনে সুন্দরবনের রাজা মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে তুলে ধরবার জন্যেই এই নাটক রচনা করেছেন। বহুবার দেখবার পরেও এখানকার লোকেদের কাছে 'মহারাজ প্রতাপাদিত্য' কখনো পুরনো বলে মনে হয় না এবং কোনো বিশিষ্ট লোক গোসাবায় এলে হেড মাস্টারবাবু নিজেই তাঁকে তাঁর এই নাটকের অভিনয় দেখাবার জন্যে মেতে ওঠেন।

গানের আসর ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গেই অমরেশবাবুর মুখে এ কথা শোনবার পর অভিনয় দেখতে না যাওয়া কি আর সম্ভব হতে পারে কখনো?

আচার্য বিনায়ক অবশ্য এ ব্যাপারে যেন একটু নিস্পৃহ। তিনি একেবারে প্রথমেই থিয়েটার দেখতে তাঁর অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন এবং না খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়তে পারলেই তিনি বেশি খুশি হবেন, এমন কথাও বলেছেন।

কিন্তু সেটি হবার নয়। গোসাবা কাছাড়ি বাড়িতে কোনো অতিথি এসে এক বেলাও অনাহারে কাটিয়েছেন এমন নজির বোধ হয় কারুরই জানা নেই। কাজেই মাস্টারমশাই ওরকম ইচ্ছে প্রকাশ করতেই অমরেশবাবুর ইঙ্গিত পেয়ে মুন্সীবাবু ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে নেমে চলে যান চটপট খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করে ফেলবার জন্যে।

মুন্সীবাবুকে তার জন্যে অবশ্য কিছুই আর করতে হয় না। এমন কি কিছু বলবারও ফুরসুৎ পান না তিনি। তাঁর বলার

আগেই গেস্টরুমের ডাইনিং টেবিলে খাবারদাবার সব এসে হাজির।

খেতে বসে অঞ্জনাও বলে, এর পরে আমার পক্ষে আর থিয়েটার দেখতে যাওয়া ভারি মুস্কিল।

কী আর এমন মুস্কিল? আমরা তো আর সেখানে সারাক্ষণ থাকছি না, কয়েকটা সীন দেখেই চলে আসব। আমাদের জন্যেই এই অভিনয়ের আয়োজন করা হয়েছে। আমরা না গেলে সেটা যে খুবই অন্যায় হবে তা বুঝতে পারছ না?—একটু ধমকের সুরেই শৈবাল অঞ্জনার কথার প্রতিবাদ করে।

তখন অবশ্য অন্য দিকে কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে জবাব দেয় অঞ্জনা। বলে, শিখার জন্যেই আমার বেশি ভয়। ওর ঘুমের সময় হয়ে গেছে। থিয়েটার দেখতে গিয়ে সেখানে ঘুমিয়ে পড়লে কী রকম ঝঞ্চাট তখন পোয়াতে হবে একবার চিন্তা করে ছাখো।

এবার একটু দমে যায় শৈবাল। কিন্তু সে মাত্র মুহূর্তের জন্যে। মেয়েই তার বাবাকে চাঙা করে তোলে। হার মানতে হয় অঞ্জনাকে। মায়ের কথার পিঠে চেঁচিয়ে ওঠে শিখা। বলে, না বাবা আমি ঘুমিয়ে পড়বো না, আমি থিয়েটার দেখবো। থিয়েটারে অনেক যুদ্ধ থাকে, যুদ্ধ দেখবো—অনেক গান শুনবো।—রীতিমতো বায়না ধরে আতুরে মেয়ে।

এই তো বাপকা বেটি! এরপর আর কিছু বলার থাকতে পারে না অঞ্জনা দেবীর। আমার শিখা দিদি সব গোলমালের সুন্দর মীমাংসা করে দিয়েছে একেবারে।—অমরেশবাবু খুশি হয়ে চেয়ার থেকে লাফিয়ে ওঠেন বলতে বলতে।

আপনি আর একা একা এখানে পড়ে থাকবেন কেন বিনায়কবাবু, চলুন স্যার আমাদের সঙ্গে। সেখানে আপনার বন্ধু ডাঃ দাসও বাড়ির সবাইকে নিয়ে আসছেন। ভালোই লাগবে আপনার।—মুন্সীবাবু নাছোড়বান্দা। তাঁর এই কথার পর আচার্য বিনায়কও আর

না বলতে পারেন না। তিনিও রাজী হয়ে যান তাঁদের সঙ্গে থিয়েটারে যেতে।—বিশেষ করে অঞ্জনাও যখন যাচ্ছে তখন···

কিন্তু অঞ্জনার মনে হঠাৎ একটি প্রশ্ন-সুন্দরবনের নদীর হাঙরের মতোই যেন মাথা জাগিয়ে দেয়। মাষ্টারমশাইয়ের পর থিয়েটার দেখতে যাওয়ায় তারও অনিচ্ছা প্রকাশে মুন্সীবাবুদের মনে আবার কোনো রকম সন্দেহ দেখা দেয় নি তো? এর পর তাই আর কোনো কথার মধ্যেই যায় না অঞ্জনা।

এর পর নৈশাহার শেষে সকন্যা অঞ্জনা যখন নতুনভাবে তৈরি হয়ে দলবলের সঙ্গে স্কুলপ্রাঙ্গণে নাটকের আসরে এসে হাজির, অভিনয় আরম্ভের জন্যে উদ্যোক্তারাও তখন প্রস্তুত। অঞ্জনার ভারি আনন্দ বিপুল জনসমাগম দেখে, বিশেষ করে গাঁয়ের মেয়েরা যে এত সংখ্যায় এখানে এসে উপস্থিত হবে তা সে ভাবতেই পারে নি।

ডাঃ দাস এসেছেন। আচার্য বিনায়কের কাছেই তিনি বসেছেন তাঁর স্ত্রী অপর্ণা ও দু'টি ছেলেমেয়েকে নিয়ে। বিনায়কই অঞ্জনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় অপর্ণার। ওদের দু'জনের মধ্যে বেশ আলাপ জমে যায় আর শিখার সঙ্গে খুবই ভাব হয়ে যায় অপর্ণার ছেলেমেয়ের।

আপনার মেয়েটি ভারি শান্তশিষ্ট। সেই থেকে সে চুপচাপ বসে আছে তার মায়ের কোলের কাছে। শিখার ঠিক পাশাপাশি। শিখার সঙ্গেই যা একআধটুকু আলাপ করছে। কিন্তু ওর ভাই বাবলু। ছেলেটি একটু দুষ্টু। তবে দুষ্টু হলেও ওর কথাবার্তাটুকু এতো মিষ্টি যে ছোটবড় কেউ ওকে ভালো না বেসে পারে না।—অঞ্জনা বলে অপর্ণাকে। অপর্ণা মুচকি হেসে মাথা নাড়ে।

জানিস আমার খুব সুন্দর একটা বাঁশি আছে?—এইটুকু সময়ের মধ্যেই শিখার সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে বাবলু যে তার গুপ্তধনের সন্ধান দিতে একটুকুও বাধে না।

কোথায়, দেখি তোমার বাঁশিটা কী রকম।—শিখা দেখতে চায়।

এই ছাখো।—বলেই বাবলু তার হাফ প্যান্টের পকেট থেকে ছোট্ট বাঁশিটা বার করে অতি উৎসাহে এমন এক হুইসিল মেরে দেয় যে সবাই ভাবে, থিয়েটার আরম্ভ হয়ে গেল তা হলে! এমন কি গ্রীনরুমেও তাড়া পড়ে যায় সেই হুইসিল শুনে এবং ড্রপসীনটাও উঠতে উঠতে অবশ্য আবার নেমে যায়। বংশীধ্বনির আসল রহস্যটা কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ফাঁস হয়ে যাবার পর।

এ নিয়ে অপর্ণার সেদিন কী লজ্জা, কী লজ্জা!

তবু ভাল যে দু'তিন মিনিটের মধ্যেই অভিনয় আরম্ভ হয়ে যায়। এবং সেই থেকে বাবলুও একেবারে শান্ত।

শৈবালকে নিয়ে বসেছেন স্বয়ং হেডমাষ্টার সতীনাথ দে মশাই। মূল অতিথিকে প্রথম থেকেই সতীনাথবাবু বুঝিয়ে চলেছেন সুন্দর-বনাধিপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের গুরুত্বের কথা।

অভিনয়ের প্রোগ্রাম বিলি হয়ে গেছে হাতে হাতে। হেডমাষ্টার নিজে একখানা প্রোগ্রাম শৈবালকে দিয়ে বল্লেন, ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' আপনি হয় তো দেখে থাকবেন। সেই মূল নাটক অবলম্বন করেই আমার এই 'মহারাজ প্রতাপাদিত্য' আমি লিখেছি। পুরানো নাটকে যে সমস্ত বিষয় বাদ পড়েছিল সেগুলোকে আমি স্থান দিয়েছি নতুন নাটকে। দেখলেই আপনি পরিষ্কার বুঝতে পারবেন।

নাটকাভিনয় এগিয়ে চলেছে। দর্শকগণ মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখছে এবং শুনছে। শৈবাল হেডমাষ্টারের প্রতি কথায় 'হুঁ' বলে সায় দিয়ে চলেছে। কী আর সে করবে এ ছাড়া। ইতিহাসের অধ্যাপক সতীনাথ ইতিহাসের মতোই যে মুখর!

একদিকে অভিনয় চলেছে, আরেকদিকে সতীনাথ বলে চলেছেন ইতিহাসের কাহিনী। কোন দিকে যে মনকে রাখবে সে, শৈবালের তাই সমস্যা।

সত্যি সত্যি ভারি সুন্দর অভিনয় করছে ছেলেরা। মেয়েদের

পার্ট ছেলেরাই করছে। পার্টগুলো সবারই কী সুন্দর মুখস্থ! শৈবাল এক ফাঁকে হেডমাষ্টারকে সাধুবাদ জানায় এ জন্যে।

শিখার কিন্তু সবচেয়ে ভালো লাগে ছোট ছোট সখিদের গান। নেচে নেচে এমন মধুর গান গেয়ে গেল ওরা যা আর ভুলতে পারে না শিখা। শুধু তাই নয়, মহারাজ প্রতাপাদিত্য যখন আসরে নেমে সদর্পে দিল্লীর বাদশাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন শিখা সেই সময় তার মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে আব্দারের সুরে বলে, ঐ যে সুন্দর সুন্দর মেয়েগুলো গান গেয়ে গেল ওদের সঙ্গে আমার ভাব করিয়ে দেবে মা? ওদের কাছে আমি গান শিখব।

গলা থেকে মেয়ের হাত দু'টোকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে 'কী যে বলে পাগলী মেয়ে' বলে হেসে ফেলে অঞ্জনা। অপর্ণাও হাসতে হাসতে শিখাকে আদর করে। নতুন বন্ধুদের কাছে একটু অপ্রস্তুত হয়ে শিখা যেন নীরব হয়ে যায়। চুপটি করে বসে থাকে।

সতীনাথ তখনো বাঙালী বীর প্রতাপের কথা বলে চলেছেন শৈবালকে। আর সুন্দরবন যে প্রতাপাদিত্যের কত প্রিয় ছিল সে কথা তিনি বুঝিয়ে চলেছেন। প্রতাপ সুন্দরবনেই থাকতেন এবং সে সময় সুন্দরবনের যে কীরূপ সমৃদ্ধি ছিল তার বিস্তৃত বিবরণ দিতে দিতে এক এক বার উত্তেজিত হয়ে ওঠেন বৃদ্ধ হেডমাষ্টার মশাই। সেই সমৃদ্ধ সুন্দরবনের আজ কী শোচনীয় অবস্থা তা বলতে গিয়েই এই উত্তেজনা।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বারভুইঞার বয়োজ্যেষ্ঠ ইসাখাঁর মুখ দিয়ে প্রতাপের নতুন রাজধানী ধূমঘাটের যে বর্ণনা প্রকাশ করেছিলেন তা মনে আছে আপনার শৈবালবাবু?

ঠিক কথাগুলো আর এতদিন পরে মনে পড়ছে না। তবে ধূমঘাট দেখে ইসাখাঁ যে বিস্মিত হয়েছিলেন সেই অভিনয়-দৃশ্যটি চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

শুনুন তা হলে। ইসাখাঁ বলছেন—'কেতাবে বোগদাদের

নাম শুনেছিলুম, নসীবে কখন দেখা হয় নি,. তোমার কল্যাণে সেটাও আজ আমার দেখা হলো। আগ্রা দেখা হয়েছে, দিল্লী দেখেছি, হিন্দুস্থানের বড় বড় সহর দেখেছি, কিন্তু বাবাজী! তোমার ধূমঘাটের মতো সহর বুঝি আর দেখব না। চারিদিকে নদী, মাঝখানে দ্বীপের মতন পরীস্থান, দূরে নিবিড় জঙ্গল—সীমাশূন্য সুন্দরবন।'

অদ্ভুত! ক্ষীরোদপ্রসাদের গোটা 'প্রতাপ আদিত্য' বইখানাই আপনি এমনি কণ্ঠস্থ করে রেখেছেন নাকি?—বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করে শৈবাল।

হ্যাঁ অনেকটা তাই। তবে কি জানেন, ইসাখাঁ প্রতাপকে যে আশ্বাস দিয়েছিলেন, 'দু'দিন বাদে সবাই বুঝবে—বাংলা মুলুক হিন্দুরও নয় মুসলমানেরও নয়—বাঙালীর' তা আর সত্য হলো না। প্রতাপের স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন তো ব্যর্থ হয়েছেই তাঁর সাধের বাংলাদেশ ও বাঙালী আজ খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন। সব কিছু হারিয়েও বাঙালী যদি তার চেতনাকে বজায় রাখতে পারত তাহলে আবার সব কিছু ফিরে পাবার আশা থাকত। কিন্তু কোথায় সেই চেতনা। সেই চেতনাকে নতুন করে জাগিয়ে তোলবার জন্যে প্রতাপের বীরত্ব মহিমার ব্যাপক প্রচার প্রয়োজন।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন মাস্টারমশাই।—ছোট্ট উত্তর দিয়ে শৈবাল অভিনয়ের দিকেই তার লক্ষ্য অব্যাহত রাখে।

একবার ভেবে দেখুন শৈবালবাবু, জ্ঞাতি শত্রুর ষড়যন্ত্রে খুড়তুত ভাই কচু রায়ের চক্রান্তে প্রতাপাদিত্যকে যদি আকবরের গোলাম মহারাজ মানসিংহের হাতে বন্দী হতে না হতো আর তিনি যদি বন্দী অবস্থায় লজ্জায় অপমানে ক্ষোভে সে সময় মারা না যেতেন তা হলে সুন্দরবন রাজ্যকে মানুষের রাজ্য হিসেবেই দেখতে পেতেন, আজকের এ চেহারা দেখতে হতো না।—সতীনাথের কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ হয়ে আসে একথা বলতে বলতে।

সত্যিই তো, ঠিকই বলেছেন আপনি সতীনাথবাবু।—শৈবাল অন্তত মৌখিক সমর্থন জানিয়ে বৃদ্ধকে শান্ত করবার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠেই হেডমাস্টার মশাই প্রতাপ-গৌরব বর্ণনা করে চলেন অবিরাম গতিতে।

আপনি তো নিশ্চয়ই জানেন শৈবালবাবু, প্রতাপকে সগরদ্বীপের রাজাও বলা হতো। গঙ্গা যেখানে সাগরের সঙ্গে গিয়ে মিলেছে সেখানে প্রতাপের এক বিরাট প্রাসাদ ছিল আর তারই সম্মুখে সেকালে সাজানো থাকতো মহারাজা প্রতাপাদিত্যের অসংখ্য বাণিজ্যতরী ও যুদ্ধজাহাজ। সম্পূর্ণ ভাবে বাঙালীদের নিয়ে তৈরি সৈন্যবাহিনী ও সেনানী মণ্ডলীর সাহায্যে প্রতাপ বারবার মোগল সম্রাট আকবরের বিপুল সৈন্যস্রোতকে পর্যুদস্ত করেছেন—রাজমহল, পাটনা দুর্গ জয় করেছেন, উড়িষ্যাকে পদানত করেছেন। সম্রাট আকবরের সমস্ত চেষ্টাকে যিনি ব্যর্থ করে দিয়েছেন বারবার। তাঁর ছেলে জাহাঙ্গীরের আমলে তিনি জীবিত থেকে তাঁর সাধের স্বাধীন বাংলার গৌরবরবিকে অস্তমিত হতে দেখবেন তা কি হতে পারে? তার আগে আগ্রার সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছে বন্দী অবস্থায় নীত ও নিগৃহীত হবার পূর্বেই পুণ্য বারানসীধামে বিষপানে আত্মহত্যা করে মহারাজ তাঁর আত্মাকে রক্ষা করেছিলেন।

আরো আছে শৈবালবাবু, আরো আছে।—এই বলে একটু যেন দম নিয়ে নেন সতীনাথ। এদিকে শৈবালের কান একেবারে ঝালা-পালা তাঁর বক্তৃতায়। হেডমাস্টারবাবুর বক্তৃতা শোনা আর স্টেজের অভিনয় দেখা দুটোই তাকে একই সঙ্গে সামলে যেতে হচ্ছে। এ যেমনি বিরক্তিকর তেমনি দুঃসহ। তাই এবার আর বৃদ্ধের কথার কোনো জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে শৈবাল যদি তাতে কোনো সুফল হয় এই আশায়। কিন্তু সে আশা নিষ্ফল। প্রধান শিক্ষক মশাইয়ের মুখরতা যেন স্তব্ধ হবার নয়। তিনি বলেই চলেন—

বুঝলেন, শুধু প্রতাপ নন, বীরত্বে প্রতাপ-মহিষীও বড়ো কম

যান না। চিতোরের রাণী পদ্মিনীর সতীত্ব ও বীরত্বের কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু সুন্দরবনের রাণী প্রতাপ-মহিষী সতী পদ্মিনীর কাহিনী আমাদের বাংলা দেশের মেয়েরা কজন জানেন?—এই প্রশ্নটি তোলবার সময় অঞ্জনার দিকে একবার তাকান সতীনাথ, তারপর আবার বলতে থাকেন—মানসিংহ বাহিনীর সঙ্গে প্রতাপের যখন ঘোরতর যুদ্ধ চলছে সে সময় সুন্দরবনের প্রাসাদপুরীতে দুরকমের পরিণতির জন্যেই প্রস্তুতি সম্পূর্ণ—বিজয়ে বিজয়োল্লাস এবং পরাজয়ে সমবেতভাবে প্রাণ বিসর্জনের ব্যবস্থা। প্রাসাদে হঠাৎ সংবাদ এলো পুত্র উদয়াদিত্য যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত এবং স্বয়ং প্রতাপ বন্দী। সংবাদ শোনা মাত্র রাণী পদ্মিনী প্রাসাদের সমগ্র নারীকুল ও শিশুদের নিয়ে গিয়ে উঠলেন দ্বারে প্রস্তুত নির্দিষ্ট জাহাজে। রাণীর আদেশে সে জাহাজকে মধ্য সমুদ্রে নিয়ে ডুবিয়ে দেওয়া হলো। ব্যস, সব শেষ! মোগল সৈন্য আর তাঁদের কেশস্পর্শ করার সুযোগ পেল না।—বলেই নীরব হয়ে গেলেন সতীনাথ।

ঠিক সে সময়েই তার মাস্টারমশাইকে দিয়ে অমরেশবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে অঞ্জনা। সতীনাথের শেষ কথা কয়টি তার কানে যেতে সে কেন যেন একটু চমকেও উঠেছে। আর শিখা তখন ঝিঁমুতে আরম্ভ করেছে, আর তাকে রাখা যাবে না, সে সংবাদই সে জানিয়েছে অমরেশবাবুকে।

অপর্ণাও বল্লে, এবার মেয়েকে নিয়ে অঞ্জনার চলে যাওয়াই ভাল। তা নইলে ঘুমন্ত মেয়েকে টেনে নিতে খুবই কষ্ট হবে।

শুধু অঞ্জনা মা কেন, এবার আমাদের সবাইকেই যেতে হবে। রাত তিনটেয় আবার আমাদের সকলকেই জাগতে হবে যে! একটু না ঘুমুলে চলবে কেন। দেখুন তো বিনায়কবাবু কটা বাজলো?—অমরেশ জিজ্ঞেস করলেন।

এগারোটা বাজতে সাত মিনিট বাকি এখনো।

ঠিক এগারটায় তাহলে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে পড়বো।

শিখা দিদিমনিকে এ সময়টুকু আপনি জাগিয়ে রাখুন।—অঞ্জনাকে এই কথা বলে শৈবালের দিকে এগিয়ে যান অমরেশবাবু যাবার উদ্যোগ করার জন্যে।

আসরে তখন প্রবল উত্তেজনা। মহারাজ প্রতাপাদিত্য দিল্লীর বাদশাহকে রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করেছেন, নিজেকে স্বাধীন নৃপতি বলে ঘোষণা করেছেন। সম্রাট আকবরের নির্দেশে বাংলার নবাব মোগল সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করেছেন সুন্দরবন রাজ্য। কিন্তু মহারাজ প্রতাপাদিত্য প্রবল বিক্রমে সে আক্রমণকে প্রতিহত করেছেন, মোগল বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে পলায়নে বাধ্য করেছেন। স্টেজের ওপর সেই যুদ্ধ দেখে এবং প্রতাপ-বাহিনীর অপূর্ব বীর্যবত্তা ও বাঙালী সৈন্যের রণদক্ষতা লক্ষ্য করে অধীর আনন্দে ও উত্তেজনায় মেতে উঠেছে ছেলে বুড়ো সমস্ত শ্রোতার দল।

তারই পরে জনরব রটে গেল প্রতাপ তাঁর পিতৃব্য রাজা বসন্ত রায়কে হত্যা করেছেন।

এ একেবারেই এক মিথ্যে রটনা শৈবালবাবু, এ আমি আপনাকে জোর করেই বলতে পারি। যে স্নেহশীল বসন্তরায় তাঁকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছেন সেই কাকাকে প্রতাপ নিজে হাতে হত্যা করেছেন, এমন মিথ্যে আর হতে পারে না।—মিথ্যের প্রতিবাদ করতে গিয়ে রাগে ক্ষোভে চোখ দুটো বড়ো হয়ে ওঠে সতীনাথের। মুহূর্ত পরেই আবার তিনি বলতে আরম্ভ করেন—

তবে কি জানেন শৈবালবাবু, যে প্রতাপাদিত্যের প্রতাপ দিল্লীর মসনদকে কাঁপিয়ে তুলেছিল, যাঁর রাজধানী যশোহর সেকালের বাঙলার রাজধানী গৌড়ের যশোহরণ করেছিল তাঁর বিরুদ্ধে কিছু কিছু ঈর্ষা-দ্বেষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠবেই। পিতৃহত্যার প্রতিশোধের নামে রাজা বসন্ত রায়ের ছেলে কচুরায় হয়ে দাঁড়ালেন সে সব ঈর্ষা-দ্বেষের মধ্যমনি। ঘরের শত্রু বিভীষণ হয়ে তিনি দিল্লী গিয়ে বাদশার সঙ্গে চক্রান্তে বসলেন। মানসিংহকে নিয়ে এলেন ডেকে

প্রবলতর শক্তি নিয়ে প্রতাপাদিত্যের রাজ্যকে আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করার জন্যে। সমস্ত অন্ধি-সন্ধিও বলে দিলেন কী করে সে উদ্দেশ্য সহজে সাধিত হতে পারে। তাই হলো। মহারাজ প্রতাপের পরাজয় ও মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবন রাজ্য তচনচ হয়ে গেল, সুন্দরবনের সর্বনাশ সম্পূর্ণ হলো!—বলেই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্লেন বৃদ্ধ সতীনাথবাবু। তারপর আবার প্রায় নিরুদ্ধকণ্ঠেই বলে চল্লেন—সুন্দর-বনের বিভিন্ন অঞ্চল যদি ঘুরে বেড়াতে পারেন তা হলে আজো প্রায় চারশ বছর আগেকার নানা চিহ্নই আপনার চোখে পড়বে শৈবালবাবু! দেখতে পাবেন বড়ো বড়ো দালান কোঠা-বাড়ির ভগ্নস্তূপ, মন্দির-দেউল ও গীর্জা-মসজিদের ধ্বংসাবশেষ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব দীঘি। এমনি সব সভ্যতার স্বাক্ষর আজো এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে আছে সুন্দরবনের সর্বত্র। আপনজনের বিশ্বাসঘাতকতায় এক একটা রাজার রাজত্ব কিভাবে তচনচ হয়ে যায় সে সাক্ষ্যই বহন করছে এইসব স্মৃতিচিহ্ন।

ঘরের শত্রু বিভীষণদের কার্যকলাপ চিরকালই এরূপ সর্বনাশ করে থাকে। এ একেবারে সনাতন ব্যাপার।—সতীনাথ নিস্তব্ধ হয়ে শোনেন শৈবালের এ মন্তব্য। আর ঠিক তখুনি দ্বিতীয় অঙ্ক শেষে ড্রপসীন পড়ে স্টেজে।

এবার উঠে পড়ুন শৈবালবাবু, উঠে পড়ুন। ঠিক সময়েই ড্রপ পড়েছে।

এখনই ওঁরা উঠে পড়বেন, এ কী বলছেন অমরেশবাবু?—একটু আপত্তির সুরেই সতীনাথ জিজ্ঞেস করেন।

হ্যাঁ হেডমাস্টারবাবু, এই-ই অনেকটা দেরি হয়ে গেল। এগারটার বেশি রাত হয়ে গেছে। শৈবালবাবু বন্দুক নিয়ে এসেছেন। তিনি শিকারে বেরুবেন, শিখা আর তার মায়েরও সুন্দরবনের বাঘ-ভালুক না দেখে চলে যাওয়া চলেনা। কাজেই রাত তিনটেয় আবার উঠতে হবে তো! বুঝতেই পারছেন।—অমরেশবাবু সমস্ত ব্যাপারটা সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলেন হেডমাস্টার বাবুকে।

তাছাড়া আপনার মুখ থেকেই তো নাটকের বিষয়বস্তু আমি মোটা-মুটি জেনে নিয়েছি। অভিনয় প্রত্যেকেরই খুব ভালো হচ্ছে, এও আমি আগেই আপনাকে বলেছি। আরো যে কথাটা বলতে চাই তা হলো, এমনি দেশপ্রেমমূলক এবং বীরত্বপূর্ণ নাটকের প্রচার যত বেশি হয় ততই ভালো।—শৈবালের শেষ মন্তব্যে খুশিতে উচ্ছল হয়ে ওঠেন সতীনাথ। বয়সে তরুণ হলেও একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর মতামতের একটা বিশেষ মূল্য আছে বৈকি! হেড মাস্টারবাবুর কাছে শৈবালের প্রশংসাবাণীর বিচার সেই দিক থেকে।

শুনুন, শুনুন স্যার। আপনি উঠে পড়েছেন, তবু আর একটি বিষয় আপনাকে জানাতে চাই। হয়তো আপনার জানাই আছে, তবু বলছি।

বেশ বলুন।—শৈবাল একটু সময় দেয় সতীনাথকে।

হ্যাঁ, বলছিলাম ঐ কোলকাতা শহরের কথা। ঐ শহর পত্তনের পর সাহেবরা দেখলে কোলকাতার এত কাছে একই সঙ্গে বাঘ-ভালুক আর দস্যু-ডাকাতের এত বড়ো রাজ্যকে তাঁবে না রাখলে চলবে না। কোলকাতার জীবনযাত্রাকে সুন্দরবনের দস্যু-ডাকাতরা যাতে হঠাৎ হঠাৎ এসে অচল করে দিতে না পারে সে জন্যেই তখনকার ইংরেজ সরকার সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চল বন্দোবস্ত করে দেন এমন কতকগুলো লোকের হাতে যারা শুধু নিজেদের স্বার্থের কথাই ভেবেছে এবং প্রায় একশ বছর ধরে অকথ্য জমিদারীপীড়ন চালিয়ে এসেছে।

এ সব কথা তো সবাই জানে সতীনাথবাবু।

সবাই নয়, অনেকেই হয়তো জানে। সেই আমলে যশোরের সেই ইংরেজ জেলা জজ হিঙ্কল সাহেবের জমিদারী বন্দোবস্ত যে একশ বছর পর বাতিল হতে চলেছে সে জন্যে সাধারণ মানুষের আনন্দের সীমা সেই জানবেন আপনি। তবে এর সঙ্গে 'হিঙ্গলগঞ্জ' নামটাও বাতিল করে দিতে পারলে বড়ো ভালো হয়, ঐ হতভাগা হিঙ্কল সাহেবের নামেই 'হিঙ্গলগঞ্জ' নামটি হয়েছে কিনা, তাই ও

নামটা একেবারে মুছে ফেলা দরকার।—সতীনাথ বেশ জোরের সঙ্গেই এই দাবী পেশ করেন।

কিন্তু এ ব্যাপারে আমার তো কোনো হাত নেই হেড মাস্টার-বাবু! আপনারা আন্দোলন করুন, হয়তো সফল হবেন। তখন 'হিঙ্গলগঞ্জ'-এর নাম পাল্টে বরং প্রতাপগঞ্জ করে নেবেন, তাতে সবাই খুশি হবে।

রাইট ইউ আর, স্যার!—শৈবালের প্রস্তাবে আহ্লাদে একেবারে আটখানা হয়ে যান বৃদ্ধ সতীনাথ। দুজনে কথায় কথায় আসর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন। অমরেশবাবুদের সঙ্গে সঙ্গে জীপগাড়ি অবধি এসে শৈবালকে বিদায়-নমস্কার জানিয়ে খুব দ্রুত পদক্ষেপেই আবার নাটকের আসরে ফিরে যান সতীনাথ। শৈবাল হাঁফ ছেড়ে বাঁচে তাঁর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে। উঃ, কী কথাই না বলতে পারেন ভদ্রলোক! ইতিহাসের চেয়েও যেন ইতিহাসের এই প্রাক্তন অধ্যাপক আরো বেশি মুখর—সতীনাথ বিদায় নিয়ে চলে গেলে শৈবালের মনের এক নিভৃত কোণ থেকে হঠাৎ যেন এমনি একটি মন্তব্যই প্রকাশ হয়ে পড়ে। এদিকে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসতে বেশ কষ্ট হয় অঞ্জনাদের।

তা ছাড়া হঠাৎ আবার উঠে আসার মুখেই অঞ্জনার হীরের দুলের প্রসঙ্গটা তুলে বসলো কিনা অপর্ণা, সেজন্যেও খানিকটা সময় কেটে গেল।

আপনার কানের দুল জোড়া কিন্তু ভারি চমৎকার দিদি! নতুন তৈরি করেছেন বুঝি!—জিজ্ঞেস করে অপর্ণা।

না, এ আমার বিয়ের উপহার। আমার এই মাস্টারমশাই-ই আমাকে এই উপহারটি দিয়েছিলেন বিয়ের সময়।—উত্তর দেয় অঞ্জনা।

কে ইনি, এই বিনায়কবাবু? এমন উজ্জ্বল হীরে এর আগে আমি সত্যি কোনোদিন দেখিনি।

কী, আবার আমার কথা কেন ?—একটু দূর থেকে নিজের নামটা কানে যেতেই কান খাড়া করে প্রশ্ন করেন আচার্য বিনায়ক। তারপর বলতে গেলে অনেকটা এক লাফেই অঞ্জনার পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়েন এবং নতুন করে জিজ্ঞেস করেন, আমাকে নিয়ে আবার আলোচনা কিসের—আমি তো এতক্ষণ চুপচাপ বসে অভিনয় দেখছিলুম ছেলেদের। বেশ অভিনয় করছে ওরা।

না, তেমন কোনো গুরুতর ব্যাপার নয়। ভয় পাওয়ার মতো কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা আলোচনা করছি না। আপনার দেওয়া এই সুন্দর হীরের দুলটি নিয়ে কথা উঠেছে, তাই আপনার নামটাও এসে পড়েছে।—শিখাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে তার আচার্যের কথার উত্তর দেয় অঞ্জনা।

তবু ভালো এ হীরের দুল যে আমার দেওয়া এখনো তা তোমার মনে আছে। আমি কিন্তু ভুলেই গিয়েছিলাম।

শিল্পীরা সবই ভুলে যান বা ভুলে যাবার ভান করেন, কিন্তু আমায় আপনি কী মনে করেছেন বলুন তো।—বাগে পেয়ে বেশ হুল-ফোটানো জবাব দেয় অঞ্জনা এবং সঙ্গে সঙ্গেই আরেকটি প্রশ্ন তুলে আগের প্রসঙ্গটি চাপা দিয়ে দেয়।

আচ্ছা মাস্টারমশাই, দেখুন না ওঁরা আসতে আবার দেরি করছেন কেন ? মেয়েটা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না যে ! দেখছেন না কেমন ঝিমুচ্ছে।

ঐতো ওঁরা তো আগে থেকেই গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদের জন্যেই বোধহয় অপেক্ষা করছেন।—পকেট থেকে টর্চটা তুলে একবার আলো ফেলে দেখে নিয়ে তাড়াতাড়ি এগোবার জন্যে অঞ্জনাকে তাড়া দেন আচার্য বিনায়ক।

ও, তাই ওদের কাউকেই দেখতে পাচ্ছিলাম না ! আচ্ছা, এবার তাহলে যাই দিদি। কোলকাতা গেলে নিশ্চয় দেখা করবেন কিন্তু। —বলেই অপর্ণার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দ্রুত পায়ে এগোয় অঞ্জনা।

শিখাকে সে কোলে নিয়েই এগোয়। তার গায়ে গায়ে চলেন আচার্য।

ওকে আমার কাছে দাও না।—বিনায়ক শিখাকে নিয়ে একটু রিলিফ দিতে চায় অঞ্জনাকে।

না, থাক।—অঞ্জনা রিলিফ চায় না। বরং পা ফেলতে ফেলতে মনের আনন্দকে সে অসঙ্কোচেই প্রকাশ করে এবং অমরেশবাবুকে অনুসরণ করে চলে। তার পিছনে পিছনে আসে বিনায়কবাবু এবং মুন্সীবাবু।

গাড়ির দিকে এগোতে এগোতে অঞ্জনা বলে, জানেন মাস্টার মশাই আমার বিয়েতে যত উপহার পেয়েছি তার মধ্যে আপনার এই হীরের দুলই আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে। আমি যেখানেই যাই এ দুল জোড়া আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে আর বড়ো বড়ো জায়গায় এ দুল পরে গিয়ে আমি খুবই আনন্দ পাই।

খুবই ভালো কথা, আমাকে আর ভালো না লাগলেও আমার দেওয়া উপহারটিকে তো ভালো লাগে! আমাকেও সেই আনন্দেই থাকতে বলছো বুঝি?—খুব নমনীয় সুরে অঞ্জনাকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করেন আচার্য বিনায়ক। পিছন থেকে বা সামনে কেউ আবার কিছু শুনে না ফেলেন সেইজন্যেই এই সাবধানতা।

না, সে ভয় ততটা নেই। যে যার ব্যাপার নিয়েই ব্যস্ত—অন্য দিকে বা অন্যের কথায় মন দেবার মতো অবকাশ কারোরই নেই। বিনায়ক তাই অনেকটা নিশ্চিন্ত।

তবে তাঁর কথার জবাবে অঞ্জনা আবার হট করে তেমন কিছু বলে না ফেলে, ঐ মুহূর্তে তেমনি একটা আশঙ্কা দুএকবার উঁকি দিয়েছিল আচার্যের মনে। কিন্তু মেয়েরা যে এসব ব্যাপারে পুরুষের চাইতে অনেক বেশি সতর্ক তা তিনি পরিষ্কার ভাবে বুঝে নিলেন অঞ্জনার একটি মাত্র কথায়।

অঞ্জনা খুব আস্তে করে বল্লে, সুযোগ পেলে আপনার এ প্রশ্নের জবাব দেবো—এখন নয়।

ব্যস ঐ টুকুই, আর কিছুই না বলে শিখাকে মুন্সীবাবুর কাছে রেখে অঞ্জনা গিয়ে সাজানো গোরুর গাড়িতে উঠে বসে। তার পর শৈবাল সে গাড়িতে গিয়ে উঠলে মুন্সীবাবু তারই কোলে তুলে দেন ঘুমিয়ে পড়া মেয়েকে। সবশেষে আচার্য বিনায়ক আর অমরেশ-বাবুকে তুলে নিয়ে গাড়ি কাছারি বাড়ির দিকে ফিরে চলে।

মুন্সীবাবু থেকেই যান। পুরো অভিনয়টাই তাঁকে দেখে যেতে হবে। বাড়ির সব ছেলেমেয়েরাও এসেছে যে! তারা কি আর নাটক শেষ না হলে উঠবে? তাছাড়া মুন্সীবাবুর তেমন তাড়াও নেই। তিনি শিকারে যাচ্ছেন না, কাজেই রাত তিনটায় জাগবার তাঁর কোনো তাগিদ নেই। তবে ব্যারাকপুর কোর্টে সোমবার তাঁর এক মামলায় হাজির থাকতেই হবে, অবশ্য সেও বেলা ছটো নাগাদ গিয়ে পৌঁছুলেই যথেষ্ট। এই ভাবে হিসেব করেই তাঁর কার্যক্রম ঠিক করে নিয়েছেন মুন্সীবাবু। শৈবালদের দায়-দায়িত্ব থেকে তিনি মুক্ত এবার, এই ভেবে কিঞ্চিৎ স্বস্তিবোধও করেন তিনি।

অভিনয় দেখে ঘরে ফিরে এসে অতিথিদের শুতে শুতে রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা হয়ে যায়।

নাও আর টু-শব্দটি নয়, চোখ বোজো।—শৈবাল চাদর মুড়ি দিয়ে পাশ ফিরে অঞ্জনাকে ঘুমোতে বলে।

বাইরের ঘরে নৈশ-পাহারা হ্যাজাক লাইটটা কালকের মতোই জ্বলে চলেছে। জ্বলুক। ও তো আর মনের ভেতরটা কিছু দেখতে পাবে না।

চোখ বুজে থাকলেই কি সব সময়ে ঘুম আসে? সবার ক্ষেত্রে সব সময়ে নিশ্চয়ই তা আসে না।

শৈবাল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু ঘুমিয়ে পড়া নয়, সে রীতিমত নাক ডাকাতে শুরু করেছে—ঘুমে এমনি সে অচৈতন্য। কিন্তু চেষ্টা করেও অঞ্জনা ঘুমোতে পারছে না। বারবার করে

কেবলই তার মনে হচ্ছে আচার্য বিনায়কের সেই শেষ প্রশ্নটির কথা, যে প্রশ্নের জবাব সে সুযোগ মতো এক সময় দেবে বলে মাস্টার মশাইকে আশ্বাস দিয়েছে।

কিন্তু সে সুযোগ কি সে আর পাবে কোনো দিন? ঘুমোতে গিয়ে উল্টে আরো কঠিন এক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় অঞ্জনাকে। সে প্রশ্নটা আসে তার নিজের মন থেকে এবং সেই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক কথা অফুরন্ত স্মৃতির মিছিল।

তাঁর দেওয়া হীরের দুলের প্রশংসা করায় অমন করে আমায় অপমান করলেন কেন মাস্টারমশাই?—মনে মনে ভাবে অঞ্জনা। তাঁর উপহারকে ভাল লাগার মানেই তো তাঁকেই ভাল লাগা, কিন্তু আচার্য বিনায়ক ঠিক তার উল্টো অর্থ করে নিলেন, এজন্যে অঞ্জনার সে কি অভিমান! অনেক কষ্টে বুকের কান্নাকে রোধ করে রাখতে হয় তাকে, কিন্তু চোখের জলে তার অজান্তেই বালিশের ওয়াড় ভিজে চলে।

হঠাৎ ঘুমন্ত শিখার সুন্দর মুখখানিকে দেখবার ভারি ইচ্ছে হলো অঞ্জনার। বাইরের ঘর থেকে হ্যাজাকের আলোর কিছুটা তারই ওপরে এসে পড়েছে। সেই আলোতেই শিখার স্নিগ্ধ মুখখানি জ্বল জ্বল করে উঠছে অঞ্জনার চোখে।

এই শিখা, এই আমার সোনার শিখা, এ তো শৈবালের মেয়ে না হয়ে…।

না, না, এমন চিন্তাকে আমার কিছুতেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়—এ অন্যায়, ঘোরতর অন্যায়।—নিজের ভেতর থেকেই ভীষণ রকমের একটা ধাক্কা খেয়ে বালিশের ওপর মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে অঞ্জনা। তার পরেই ঘুমে একেবারে নিস্তেজ অসাড়।

উল্টো দিকে অমরেশবাবুর পাশের ঘরে আচার্য বিনায়কের চোখেও ঘুম নেই। সুযোগ মতো অঞ্জনা তাঁর কথার নাকি জবাব দেবে বলেছে। কিন্তু কী সে উত্তর হতে পারে তা ভাবতে ভাবতে স্মৃতির

সমুদ্র মন্থন করে চলেছেন তিনি। তাতে ভারে ভারে আনন্দ-বেদনার অমৃত-গরল উঠে আসছে আর তারই ফলে আচার্য উদ্‌ভ্রান্ত। এমনি অবস্থায় কি আর ঘুমোতে পারে মানুষ?

হঠাৎ একদিনের একটি বিশেষ ঘটনার স্মৃতি আচ্ছন্ন করে ফেলে আচার্যের মনকে!

একটি গান চমৎকার ভাবে শিখেছে অঞ্জনা। সামান্য দোষ-ত্রুটি যা ছিল তা সংশোধন করে শেষবারের মতো সে যখন সেদিন সে গানটি গাইল প্রচুর বাহবা দিলেন তাকে আচার্য বিনায়ক। পিঠ চাপড়ানিতে নুয়ে পড়ে শিক্ষককে প্রণাম নিবেদন করলো ছাত্রী এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্লাউজের ভেতর থেকে বার করে খামে আঁটা একখানা চিঠিও।

চিঠিখানা মাস্টারমশাইয়ের পায়ে রেখে সভয় সলজ্জ কণ্ঠে অঞ্জনা সেদিন দুটি মাত্র কথা বলেছিল তাঁকে—'এ চিঠিখানা এখানে খুলবেন না মাস্টারমশাই, বাড়ি গিয়ে পড়বেন।' এই বলেই বিদায় কালীন চায়ের কাপটি এনে দিয়ে অঞ্জনা সরে গিয়েছিল।

তার পরে যে কাণ্ড ঘটেছিল তা ভেবে শিউরে ওঠেন বিনায়কবাবু। বাস্তবিকই চা খাওয়া শেষ করে কী ভাবে যে তিনি ভুলে অঞ্জনার চিঠিখানা গানের ঘরে ফেলে রেখেই চলে এসেছিলেন সে রহস্যের মীমাংসা তিনি করে উঠতে পারেন নি। রাস্তায় এসে ট্রামে উঠতে যাবার মুখে হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল সেই চিঠির কথা। ছুটতে ছুটতে আবার আচার্যকে যেতে হয়েছিল অঞ্জনাদের বাড়িতে।

কী হয়েছে মাস্টারমশাই, আবার ফিরে এলেন?—সিঁড়ির মুখে দোতলায় দেখা হতেই অঞ্জনা জিজ্ঞেস করেছিল।

কিছু নয়।—বলে সরাসরি কোণার দিকে গানের ঘরে ঢুকেই চিঠিখানা কুড়িয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসেছিলেন মাস্টার মশাই। অন্য কেউ আর তা টের পায় নি।

কিন্তু কী ভীষণ রকমের কেলেঙ্কারিই না সেদিন হয়ে যেত, যদি

অঞ্জনার বিয়ের প্রায় বছর দুই আগে সেদিনের ঐ চিঠিখানা বাড়ির অন্য কারুর হাতে গিয়ে পড়ত! —ভাবতে ভাবতে উঠে বসেন বিনায়কবাবু।

ভাবে ভাষায় আবেগে অপূর্ব সেই চিঠিখানা অতি সঙ্গোপনে নিজের হেফাজতেই অনেকদিন রেখে দিয়েছিলেন আচার্য। অঞ্জনার সে চিঠিখানা প্রায়ই তিনি একান্তে বসে বসে পড়তেন। একবার নয়, দুবার নয়,- বারবার পড়েও যেন তাঁর তৃপ্তি হতো না। কিন্তু কবে গিয়ে আবার স্ত্রীর হাতে পড়ে, এই ভয়ে নিজের হাতেই একদিন টুকরো টুকরো করে তিনি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন চিঠিখানা।

কিন্তু আচার্য যে বিবাহিত সে কথা তিনি তিন বছর ধরে গোপন রেখেছিলেন কেন অঞ্জনাদের বাড়িতে ?

এত কাল পরে নিজের মনেই আজ হঠাৎ সে প্রশ্ন জেগে ওঠে। মাষ্টারমশাই নিজের কাছেই নিজে আবার সন্তোষজনক উত্তর দেন সে প্রশ্নের।

সে তথ্য প্রকাশের কোনো কারণই ঘটে নি অঞ্জনার সে চিঠি পাবার আগে। কাজেই তা গোপন রাখার কোনো কথাই ওঠে না। অঞ্জনাকে গান শেখাতে আরম্ভ করবার পর বছর পার হবার আগেই ছাত্রীর চালচলন দেখে আচার্য টের পেয়েছিলেন তার মনোলোকের ভাবনা-চিন্তার গতি-প্রকৃতির। আর ক্রমশই যে তাঁর ছাত্রীর সেই রকম-সকম বেড়েই চলছিল তাও তিনি লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু একদিন যে অঞ্জনা এমনি এক চিঠির মাধ্যমে তাঁর উদ্দেশ্যেই প্রেম নিবেদন করে বসবে, এবং এতটা দুঃসাহস যে কোনোদিন অঞ্জনার হতে পারবে বিনায়ক তা স্বপ্নেও ভাবেন নি। বাড়ি পৌঁছে নয়, ট্রামে বসেই সেদিন ঐ চিঠিখানা এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলে বিস্ময়-বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন আচার্য। তাঁর মনে হয়েছিল, কোনো কোনো ব্যাপারে ছেলেদের চাইতে মেয়েদের সাহস অনেক বেশি এবং শুধু সাহস নয়, বুদ্ধিও। এবং প্রেমের ব্যাপারে তো বটেই। তবে এ

কথাও মনে হয়েছিল, তিনি যে বিবাহিত ঘুণাক্ষরে তার হদিস পেলে অঞ্জনা ওরকম ভুল করতো না। এ শুধু মনে হওয়া নয়, সত্যি তাই। কারণ পরদিন গান শেখাতে গিয়ে আচার্য যখন কথাচ্ছলে তাঁর ছাত্রীকে বললেন, 'এক বছর কমাস পর আমার স্ত্রী বাপের বাড়ি থেকে এই কদিন মাত্র আগে ফিরেছেন, তোমাদের বাড়িতে একদিন বেড়াতে নিয়ে আসব' সে কথা শুনে অঞ্জনার প্রায় মূর্ছা যাবার উপক্রম, লজ্জায় একেবারে যেন দেয়ালের সঙ্গে মিশে যেতে চাইছিল সে।

তার পর থেকেই ধীরে ধীরে একটা পরিবর্তন আসতে থাকে অঞ্জনার মধ্যে। তা হলেও তাঁর প্রতি অঞ্জনার শ্রদ্ধাপূর্ণ গভীর ভালবাসার যে অভাব ঘটেছে কোনোদিন এমন কথা কখনো মনে হয়নি আচার্যের।

এই সব পুরনো স্মৃতিই মনের ওপর চাবুক মেরে মেরে বিনায়ককে সারাক্ষণ জাগিয়ে রাখছে, মুহূর্তের জন্যেও দু চোখের পাতা মিলতে দিচ্ছে না। অঞ্জনার অতীত দিনের মিনতি-মুখর চোখের মণি দুটি আজও যদি আবার তেমনি তাঁর সামনে বারবার জ্বলে জ্বলে ওঠে, তা হলে কী করেই বা ঘুমোবেন আচার্য বিনায়ক?

॥ ছয় ॥

ঠিক রাত তিনটে। ঘড়িতে এলার্ম বাজতেই ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠে বসেন অমরেশবাবু। তার পর চোখ রগড়াতে রগড়াতে বাইরে বেরিয়ে এসে এক এক করে ডেকে তোলেন সবাইকে।

সবাইকে আর কি, বিনায়ক দস্তিদার তো জেগেই কাটিয়েছেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। ওদিকে রাত দেড়টা নাগাদ ঘুম ভেঙে গেছে শিখার। মাকেও জাগতে হয়েছে মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে। তাকে ঘুম পাড়াতে গিয়েই লক্ষ্য করেছে অঞ্জনা, তার আচার্য তখনো পায়চারি করছেন ছাতের ওপর। খুবই দুঃখ লাগে তার মনে। বাইরে ছুটে যেতেও ইচ্ছে হয়। কিন্তু ভয়ও আবার নাড়া দেয় তার মনকে। তার পর থেকে তারও আর ঘুম হয় নি। তার দিক থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে আচার্য যে মনের দুঃখে আবার তাঁর ঘরে ফিরে গিয়েছেন তাও পর্যন্ত অঞ্জনা চুপি চুপি লক্ষ্য করেছে। তার পর আর সে কিছু জানে না।

সেই নির্বোধ নীরবতার মধ্যে ডাকাডাকি করে সবাইকে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হবার তাগিদ দিলেন অমরেশবাবু। বলাই ছিল, ভোর চারটা না বাজতেই বেরিয়ে পড়তে হবে। অন্ধকার থাকতে থাকতে গিয়ে জায়গা মতো পৌঁছুতে না পারলে কোনো শিকারই মিলবে না। মোটরলঞ্চেও অন্তত এক ঘণ্টার পথ। কাজেই চারটায় লঞ্চ না ছাড়লে চলবে কেন?

কিন্তু সত্যি সত্যি তা আর হয়ে ওঠে না। তৈরি হয়ে নিতে নিতেই ঘণ্টা-খানেক সময় কাটে। তার পর ফেরিঘাটে গিয়ে পৌঁছুতেও তো কিছুটা সময় লাগে। তাই মোটরলঞ্চের যাত্রা শুরু হতে যদি চারটা বেজে সতেরো হয়ে যায় তার জন্যে কাউকেই

দোষী করা চলে না। তবু শৈবাল অঞ্জনাকেই এই দেরির জন্যে দায়ী করে। সাজগোজ করতে করতে সে-ই নাকি বাড়তি সময়টা নষ্ট করেছে। কিন্তু সেটা তো আর অস্বাভাবিক নয়, অসম্ভবও নয়। তাই সে অভিযোগের কোনো উত্তরই দেয় না অঞ্জনা। ভোর রাতের শান্ত আবহাওয়ার মতোই সে চুপচাপ বসে থাকে।

শিখার চোখে তখনো ভীষণ ঘুম। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যাবার ফল। এতগুলো লোকের হট্টগোলেও শিখা জেগে উঠছে না, আশ্চর্য! লঞ্চে ওঠবার পর তাই মায়ের কোল থেকে নামিয়ে একদিকে বসবার বেঞ্চির এক কোণে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে।

কিন্তু শীতের রাত, নদীর হাওয়ায় মেয়েটার আবার ঠাণ্ডা লেগে যাবে না তো! গরম পোশাক-পরিচ্ছদে তাকে জড়িয়েও ভয় কাটে না অঞ্জনার। নিজের গা থেকে স্কার্ফ টা খুলে নিয়ে ভাল করে সে ঢেকেঢুকে দেয় শিখাকে।

এটা কী হচ্ছে! শিখা তো দিব্যি আছে। ওর ওপর আবার ওটা চাপানো কেন? দমবন্ধ হয়ে যাবে যে! তা ছাড়া নিজেরও তো হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। সে খেয়ালটাও থাকা উচিত। —শৈবাল এই বলে প্রকারান্তরে সাবধান করে স্ত্রীকে।

কিছুই হবে না। লোনা হাওয়ায় ঠাণ্ডা লাগবার ভয় নেই কোনো। শিখার জন্যেও চিন্তার কিছু নেই। সুন্দরবনে ভয় শুধু বাঘ-ভালুকের আর হাঙর-কুমীরের। আর কিছুর নয়।— অমরেশবাবুর আশ্বাসে স্বস্তি পায় সবাই। সকলেই চুপ করে যায়। আচার্য বিনায়ক তো প্রথম থেকেই নীরব। হয়তো পাঁচ-ছয় বছর আগেকার সব কথাই তিনি তখনো ভেবে চলেছেন।

মোটর লঞ্চের পিছনে পিছনে চলেছে একটা জালিবোট। শিকারে এই জালিবোট অপরিহার্য। সুন্দরবনে শিকার করা এ ছাড়া একরূপ অসম্ভব। লঞ্চ আর তীরভূমির ব্রীজ এই জালিবোট। সোজা বাংলায় যাকে বলা হয় সাঁকো।

মাতলা নদী দিয়ে লঞ্চ যতই এগিয়ে চলে অমরেশবাবুর গল্পও তেমনি খোলে। ভয় লাগবার মতোই সব ভীষণ ভীষণ গল্প তিনি একের পর এক বলে চলেন।

অমরেশবাবু একাই বক্তা, আর সবাই শ্রোতা। মাঝে মাঝে মাঝি-মাল্লারা ফোড়ন কাটে। তার মানে অমরেশবাবুর কথাতেই সায় দেয় এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে নিজেদের দু'একটা অভিজ্ঞতার গল্পও সাজিয়ে গুছিয়ে বলে ফেলে বাবুদের খুশি করার জন্যে। এমনি করে দুচার টাকা বখশিসও যে তারা হরদম পেয়ে থাকে!

শিকারের সাকরেৎ হিসেবে আর যে দুটি বন্দুক ও লাঠিধারী ছেলেকে নিয়ে আসা হয়েছে ফেরিঘাট থেকে তারা আবার এক একটা পিলে চমকানো ঘটনা মনে করিয়ে দেয় অমরেশবাবুকে। আর তিনি বেশ রসিয়ে রসিয়ে সে সব কাহিনীই বর্ণনা করে যান অঞ্জনাদের কাছে।

একেবারে সুন্দরবনের আদি কথা থেকেই শুরু করেন অমরেশ-বাবু। সুন্দরী গাছের বিরাট অরণ্যের বিরাটতর ইতিকথা। নানা ধরনের বিচিত্র বন্য জীব জন্তুর বাসস্থান এ অঞ্চল। কিন্তু হিংস্র পশুর চেয়েও মানুষ যে হিংস্রতর তার প্রমাণ দিয়েছে শিকারিরা। শিকারের লোভে অনেক রকমের জন্তুকেই ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে তারা এ বন থেকে।

কী রকম?—জিজ্ঞেস করে শৈবাল।

এই ধরুন গণ্ডারের কথাই বলি। একশ বছর আগেও সুন্দর বনে নাকি অনেক গণ্ডার পাওয়া যেত। এখানকার এক ধরনের শিংওয়ালা গণ্ডারের কথা আমরাও ছোটবেলায় শুনেছি বুড়োদের মুখে। বুড়োরা আমাদের ভয় দেখাতেন তাঁদের ছোটবেলায় দেখা সেই শিংওয়ালা গণ্ডারদের কথা তুলে। কিন্তু কোথায় এখন সেই সব গণ্ডার? আমাদের জীবনে আমরা তো কখনো গণ্ডার দেখিনি সুন্দরবনে। শিকারিদের হাতে পড়ে ওরা একেবারে ঝাড়ে মূলে

নির্বংশ !—খুব বেদনার্ত স্বরেই এই কথা কয়টি বলেন অমরেশবাবু এবং বাঘ নির্বংশ হলো না অথচ গণ্ডার নিঃশেষ হয়ে গেল কি করে শৈবাল তার কারণ জানতে চাইলে তিনি সে বিষয়টিও সবাইকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিলেন।

জানেন নিশ্চয়ই পশুর মধ্যে খুব শক্তিশালী হলেও গণ্ডার মোটেই চালাক নয়, বরং নির্বোধ ধরনের জন্তু। লুকোচুরি ব্যাপারটা ওরা মোটেই বোঝে না, খুব সহজেই শিকারিদের কাছে ধরা পড়ে যায়। আসলে তার জন্যেই সুন্দরবন থেকে এ জাতটা এত তাড়াতাড়ি নির্মূল হয়ে এসেছে। আরো একটা বড়ো কারণ আছে। শৈবাল বাবু, আপনি বাঘের কথা তুলেছেন, কিন্তু গণ্ডার-মা কখনো বাঘিনীর মতো একাধিক বাচ্চা দেয় না, আর ওরা বাচ্চা পেটে ধরে দীর্ঘ দেড় বছর ধরে। কাজেই গণ্ডারের সংখ্যা বাড়বার কোনো কথাই ওঠে না। অদূর ভবিষ্যতে গোটা দেশ থেকেই গণ্ডার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে কিনা সেটাই এখন প্রশ্ন।

অতদূর আমি এখন ভাবতে চাইনা, আপনি যে শিংওয়ালা গণ্ডারের কথা বল্লেন সে রকম গণ্ডার আপনার চোখে না পড়তে পারে, হ্যামিল্টন স্টেটের বাইরে যে বিরাট সুন্দরবন অঞ্চল রয়েছে তার সব কথা তো আর আপনার জানা থাকবার কথা নয়। তবু আপনি কি নিশ্চিতভাবে বলতে পারেন যে, সে জাতের গণ্ডার আজকাল মোটেই আর দেখা যায় না সুন্দরবনে?—আবার প্রশ্ন তোলে শৈবাল।

শুধু সে জাতের কেন বলছেন, কোনো রকমের গণ্ডারেরই আর তেমন হদিস পাওয়া যায় না এখানে প্রায় আশি বিরাশি বছর ধরে। অথচ আজও গেড়াখাল অর্থাৎ গণ্ডারের খাল তাদের অস্তিত্বের পরিচয় দিয়ে আসছে।

এমনি আর কোন কোন শ্রেণীর জীব-জন্তুর কথা আপনি জানেন যেগুলো একেবারে লোপ পেয়ে গেছে?—এতক্ষণে মুখ খোলেন

আচার্য বিনায়ক। কি ভাবতে ভাবতে যেন হঠাৎ তিনি এই প্রশ্ন করে বসেন সবাইকে অবাক করে দিয়ে।

সে সব জীব-জন্তু সবার কথাই যে আমি জানি তা নয়। তবে একেবারে অল্প বয়েস থেকে এ অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে বলে এ সব বিষয় নিয়ে অনেক কথাই ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, তাই কিছু কিছু পুরনো তথ্য আপনাদের জানাতে পারি।

বেশ তো আরো এক আধটা দৃষ্টান্তের কথা বলুন না।

যেমন ধরুন, সুন্দরবনের জলচর মোষেরও নাকি এক সময়ে খুব নাম-ডাক ছিল। কিন্তু তাদের বংশও নিঃশেষ হয়ে গেছে এই শতাব্দী শুরু হবার অনেক আগেই। এমনি ভাবে কত রকমের জীব-জন্তুকে যে লয় করে দিয়েছে শিকারিরা তার ঠিক ঠিকানা নেই।

এতক্ষণে বুঝা গেল, শিকারে আপনার সমর্থন নেই এবং শিকারিদের আপনি পছন্দ করেন না। কী বলেন ?—শৈবাল তার শুইয়ে রাখা ৪৭৫ ম্যাগনাম বন্দুকটার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন অমরেশবাবুকে।

না, তা কেন বলবো, তবে শিকার সম্পর্কে বিশেষ রকমের কড়া-কড়ি করা নিশ্চয়ই দরকার।

সব রকমের শিকার সম্পর্কেই কি কড়াকড়ির পক্ষপাতী আপনি ? —অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর অকস্মাৎ এই রহস্যময় প্রশ্নটি করে বসে অঞ্জনা।

ঠিক তাই।—খুব তলিয়ে না দেখেই অমরেশবাবু অঞ্জনার জিজ্ঞাসার জবাব দেন এবং তাঁর মতের পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেন, ইংরেজ আমলে বিদেশী শিকারিদের তাণ্ডব চলেছিল এই সুন্দরবনে। নিয়ন্ত্রণের বিধিনিষেধ থাকলেও বেআইনী গোপন শিকার রোধ করতে পারেন নি ইংরেজ সরকার। এখন স্বাধীন গভর্ণমেণ্টও যদি কোনো কঠোর ব্যবস্থা না করেন তাহলে হয়তো কবে দেখা যাবে

সুন্দরবনের বিখ্যাত ডোরাকাটা বাঘেরও অর্থাৎ সেই রয়াল বেঙ্গল টাইগারেরও আর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

বাঘের কথাই আগে বলুন শুনি।—বাঘের নামে উল্লসিত হয়ে ওঠে শৈবাল।

শুধু বাঘের কেন, সুন্দরবনের কুমীরের কাহিনীও জানবার মতো। বরং আমার মতে কুমীরদের বলা যায় এ অঞ্চলের আদি কুলীন।

সে আবার কেমন ?

তাই বলছি শুনুন। সুন্দরবনে আগে তো আর কোনো মানুষের বাস ছিল না, কাজেই মানুষ যে তাদের খাদ্য হতে পারে এ ধারণাই ছিল না এখানকার বাঘেদের। বনের শূয়র আর হরিণই ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। শুধু বাঘেদের নয়, কুমীরদেরও।

সে কি রকম কথা ?—বিস্ময় প্রকাশ করেন আচার্য বিনায়ক।

হ্যাঁ, তাই। এবং তার যথেষ্ট কারণও রয়েছে। কয়েক শ বছর আগে সুন্দরবনের জমি এতটা উঁচু ছিল না। মাঝে মাঝেই বান এসে ডুবিয়ে দিত সারা অঞ্চল। আর হরিণ-শূয়র জাতীয় পশুগুলো বেশির ভাগই কুমীরের পেটে চলে যেত। যে কোন বন্যপশু শিকারে বাঘেদের কিছুটা দৌড়াদৌড়ি বা শ্রমস্বীকার করতে হতো। কিন্তু বানের সময় খাদ্য সংগ্রহে কুমীরদের কোনো রকম কষ্টই করতে হতো না। কি জীবিত কি মৃত অসংখ্য হরিণ-শূয়র ইত্যাদি জীব-জন্তু ভোজ্য বস্তু হিসেবে আপনা থেকেই ভেসে ভেসে আসত তাদের মুখের সামনে। এ তাদের কৌলিন্যের নমস্কারী ছাড়া আর কি !

ঠিকই বলেছেন কর্তাবাবু, কুমীর মশাইরাই আমারগো এই রাজ্যের আসল কুলীন।—বুড়ো সারেঙ বৈরাম অমরেশবাবুকে সমর্থন জানিয়ে মন্তব্য করে।

কেন, সুন্দরবনের শূয়র বা হরিণের মতো বাঘেরা কখনো ভেসে যেত না বন্যায় ?—এই বিচিত্র জিজ্ঞাসাও আসে শ্রীমতী অঞ্জনার তরফ

থেকে। তার ধারণা বাঘ যদি জীবিত অবস্থায় বানে ভেসে যেত তা হলে বাঘে-কুমীরে অন্তত মাঝে মাঝে বেশ লড়াই হতো।

তা সাধারণত হতো না। তার কারণ, বাঘের নখ থাকার সুবিধে। বেশি জলে দাঁড়াবার উপায় না থাকলেও আগের দিনে বানের সময় নখ দিয়ে হেলানো গাছ আঁকড়ে ধরে বা তার ওপরে উঠে কোনো রকমে বেঁচে থাকত তারা। একালেও বন্যার সময় তারা তাই করে। তবে এখন জমি উঁচু হয়ে যাওয়ায় আগের মতো তেমন আর ঘন ঘন বন্যা হয় না। কিন্তু সেযুগে পরপর এক একটা বড় বড় প্লাবনের শেষে ভারি অসুবিধেয় পড়তে হতো তাদের।

সেই অসুবিধে কি করে কাটিয়ে উঠত তারা?—এবারও প্রশ্ন করে অঞ্জনা।

এমনি অবস্থায় পড়ে খাদ্য সম্বন্ধে যা হোক একটা গবেষণা না আরম্ভ করে আর উপায় কি? আশপাশে তখন এমন কোনো জনবসতিও ছিল না যে, মাঠ-ময়দানে গিয়ে সেখান থেকে মাঝে মাঝে দু-চারটে করে গৃহপালিত পশু বা এক আধটা করে মানুষ শিকার করে নিয়ে আসবে।

তাই তো, ঠিকই বলেছেন কর্তামশাই। সেই আমলে কি আর মানুষ থাকত নাকি এই সুন্দরবনে!—বুড়ো সারেঙ আরেকবার তার সমর্থন জানায় অমরেশবাবুকে।

অগত্যা বাধ্য হয়েই সুন্দরবনের বাঘেরা প্রথমে শুরু করল গোসাপ জাতীয় জলজন্তু আহার করতে। কিন্তু এত সামান্য আহারে বাঘের মতো জানোয়ারের আগুনে-খিদের নিবৃত্তি হয় কখনো? তাই কিছুদিন বাদেই নতুন খাদ্যের গবেষণায় আবার মশগুল হয়ে ওঠে সুন্দরবনের বাঘের দল।

এই যা দেখছি, পশুজগতেও ডক্টরেট বিতরণের একটা ব্যবস্থা করে ফেললে মন্দ হয় না বোধ হয়।—হাসতে হাসতে বলে শৈবাল।

ওঁর যত আজগুবি কথা !—বলেই মুখ ঘুরিয়ে নেয় অঞ্জনা।

না, না, একেবারে হেসে উড়িয়ে দেবার কথা নয় শৈবালবাবু, এ বিষয়টা সত্যি সত্যি ভারি ইণ্টারেস্টিং।—অমরেশবাবুর এ জবাবের পর আর ব্যঙ্গ-কৌতুক চলে না। সেই আবহাওয়া ভেঙে দিয়ে আচার্য বিনায়ক গুরুগম্ভীরভাবে জানতে চাইলেন বাঘেদের শেষবারের গবেষণার ফলাফল।

এবারে গবেষণায় কোন জাতীয় আহার আবিষ্কার করল বাঘেরা ?

অমরেশবাবু বললেন, মানুষ।

গোসাপের পরেই একেবারে মানুষ ! মাঝামাঝি আর কিছু নেই ?—আর যেন প্রশ্ন না করে থাকতে পারে না অঞ্জনা। বেশ কিছুক্ষণ ধরে সে শুধু শুনেই যাচ্ছিল, কচিৎ কখনো দু'একটা ফোড়ন কাটছিল শৈবালের কথার ওপর। আসলে তার লক্ষ্য ছিল শিখার দিকে, কখন আবার মেয়েটার ঘুম ভাঙে।

গোটা বিষয়টি এবার বেশ প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেন অমরেশবাবু। তিনি বললেন, হ্যাঁ, মানুষ ছাড়া আর কি ! মানুষ ছাড়া আর যা কিছু জীবজন্তু তার প্রায় সবই তো আগে থেকেই বাঘের খাদ্য। তবে মানুষ দেখলে সুন্দরবনের যে বাঘ আগে ভয়ে পালিয়ে যেত, তারা যখন একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পেলে আর মানুষ শিকার করা যে কত সহজ তা বুঝতে পারলে তখন আর তাদের পায় কে ? ভয় ভেঙে যাবার পর এমন কি ছোট ছোট বাঘের বাচ্চারাও তাদের মায়েদের সঙ্গে গিয়ে গিয়ে মানুষ শিকারের শিক্ষা নিতে লাগল।

তাই নাকি ?—বাঘের কাহিনী শুনতে শুনতে চোখের তারা দুটো যেন বড় হয়ে ওঠে অঞ্জনার। সেই বড় বড় চোখেই সে একবার তাকায় তার আচার্যের দিকে এবং জিজ্ঞেস করে অমরেশবাবুকে।

হ্যাঁ, ঠিক তাই। এমনি করেই সুন্দরবনের সমস্ত বাঘই নরখাদক হয়ে ওঠে। এখন মানুষই হলো তাদের প্রধান ও প্রিয়

খাদ্য। আর জানেন কি আপনারা 'বিড়ালের মাসী' বাঘিনীরা অনেকগুলো করে বাচ্চা দেয় এক এক বারে? দুটো থেকে চারটে তো স্বাভাবিক, সময় সময় ছটা পর্যন্ত। তা ছাড়া ওদের পেটে বাচ্চা ধরবার সময়টাও ভারি কম—সাড়ে তিন থেকে চার মাস মাত্র। এসব কারণেই সুন্দরবনে বাঘেদের রাজত্ব চলে এসেছে দীর্ঘকাল ধরে। শিকারী মানুষদের দাপটে অবশ্য একালে ওরা কিছুটা দমে আছে এবং সংখ্যাতেও অনেকটা কমে গেছে, তাহলেও আজও নির্ভয়ে চলাফেরা করা সম্ভব নয় সুন্দরবনে।

কিন্তু সুন্দরবনে তো আর একটি দুটি বাঘ থাকে না বা থাকত না। তা ছাড়া তেমন লোকবসতিও যখন ছিল না সুন্দরবনে, এত বাঘের জন্যে তখন বিপুল পরিমাণ নরমাংসের খোরাক জুটত কোত্থেকে?—জানবার জন্যে কৌতূহলী হয়ে ওঠে শৈবাল।

কেন, সুন্দরবনে আগে লোকবসতি ছিল না বটে, তবে লোকের আনাগোনা সেখানে মোটেই নতুন নয়। মধু সংগ্রহের জন্যেই তো রোজ কত লোক আসে এই সুন্দরবনে! এ শুধু আজকের কথা নয়, বহুকাল ধরেই এ কাজ চলে আসছে। এ ছাড়া কাঠুরে ও জেলে শ্রেণীর লোকেরা তো আছেই। এরাই দীর্ঘকাল ধরে রয়াল বেঙ্গল টাইগারদের নরমাংসের খিদে মিটিয়ে আসছে এবং মানুষের রক্তের স্বাদের আকর্ষণ যে কী ভয়ঙ্কর সুন্দরবনের বাঘ এদের কাছ থেকেই প্রথম তা বুঝতে পেরেছে।

নিশ্চলভাবে অমরেশবাবুর মুখে এতক্ষণ বাঘের গল্প শুনে যেতে থাকলেও 'নরমাংস' এবং 'মানুষের রক্তের স্বাদ' ইত্যাদি কথাগুলো কানে আসতেই হকচকিয়ে ওঠে অঞ্জনা, ভয়ে একেবারে যেন জড়সড় হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, আতঙ্কিত সুরে বলেই ফেলে—থাক অমরেশ-বাবু, বাঘ-টাগ দেখবার আর দরকার নেই, বরং ফিরেই চলুন। আপনার কথাবার্তা শুনে আর ভরসা পাচ্ছি নে। কে জানে কোথায় কোন ঝোপঝাড়ে আবার রয়াল বেঙ্গল টাইগার লুকিয়ে আছে, ঘাড়ের

ওপর হঠাৎ এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেই তো খতম! দরকার নেই বাবা, আর আমার বাঘ দেখার সখ নেই।

সে কি মা, গল্প শুনেই এত ভয়! বাঘের চেয়ে মানুষ বড় কম যায় না হিংস্রতায়, এ কথা মনে রাখলে ভয় অনেকটা কেটে যাবে দেখবেন। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, ক্রমে ক্রমে সাহস বেড়ে যাওয়ায় সুন্দরবনের বাঘ ইদানীং আশ-পাশের গ্রামাঞ্চলে গিয়েও হামেশাই হানা দিচ্ছে। মানুষ পেল তো ভাল, আর না পেল তো গোরু-বাছুর নিয়েই দে চম্পট! সেই দুঃসাহসই ধীরে ধীরে এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আজকাল এমন সব ঘটনা ঘটছে যা সহজে বিশ্বাস করাটাই মুস্কিল।

কী রকম, বলুন না তেমন দু-একটা কাহিনীই শোনা যাক।

মনের বাঘ পালিয়েছে তা হলে। নিজেকে কিছুটা সামলে নিতে পেরেছ দেখছি। বহুৎ আচ্ছা! কিঞ্চিৎ খোঁচা দিয়ে আরম্ভ করলেও শেষ পর্যন্ত আচার্য বিনায়ক বাহবাই দেন তাঁর ছাত্রীকে। অঞ্জনার সঙ্গে অমরেশবাবুর আলোচনার গতি তাঁর মনকেও কিছুটা চঞ্চল করে তুলেছিল যে!

ঠিক সেই সময় শিখা পাশ ফিরে শোয়। অঞ্জনা তার পাতলা ঘুমকে নিবিড় করে তোলার চেষ্টা করে আস্তে আস্তে তার পিঠ চাপড়ে। একটু বাদেই অমরেশবাবু আবার তাঁর গল্প বলা আরম্ভ করেন।

এই তো মাত্র কয়েক মাস আগে একটা সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে গেল। রাজ্যপাল দলবল নিয়ে এসেছিলেন সুন্দরবনে বেড়াতে। মাঝনদী থেকে হঠাৎ একটা সোরগোল শোনা গেল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, একজন জেলে মারা পড়েছে বাঘের হাতে।

কী করে মারা পড়ল?—শৈবাল জিজ্ঞেস করে।

অনেকগুলো মাছধরা নৌকো নদীর এদিক-ওদিক রাত থেকে ছড়ানো ছিল। একটিমাত্র জেলে-নৌকো নোঙর করেছিল একটা

খাড়ির মধ্যে। নিয়মমতো কিছু খেয়েদেয়ে মাছধরা শুরু করা হবে সকালবেলা, সব ব্যবস্থাই ঠিকঠাক। সেই ব্যবস্থা মতোই সকালের খাওয়া সেরে নিয়ে নোঙরের দড়ি খুলে আনবার জন্যে খাড়ির একপারে নৌকো থেকে লাফিয়ে পড়ে চব্বিশ-পঁচিশ বছরের একটি জোয়ান ছেলে।

তার পর ?—রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করে অঞ্জনা।

তার পর দড়ি খুলে আনতে গিয়ে যেই সে একটু মাথা উঁচু করেছে আর অমনি কোথা থেকে একটা প্রকাণ্ড বাঘ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর। হাত-পা নাড়বার কিংবা ডাকাডাকি করবার কোনো সুযোগই পায় নি ছেলেটি। আক্রমণকারী বাঘ সঙ্গে সঙ্গেই তার ঘাড় মটকে ফেলেছে আর সঙ্গে সঙ্গেই তার ভবলীলা শেষ!

কী সাংঘাতিক ব্যাপার!—অঞ্জনার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে শুনে। ভয়ে ভয়ে তবু সে জিজ্ঞেস করে, ওর সঙ্গী-সাথীরা কোনো চেষ্টাই করল না ছেলেটাকে বাঁচাবার জন্যে ?

তা করেছিল বৈ কি! সঙ্গীরা তার বিপদ টের পেয়েই হৈ-হল্লা করে বাঘটাকে তাড়া করার চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু কে কাকে ভ্রূক্ষেপ করে! সুন্দরবনে যারা আসে তাদের সকলের রীতিনীতি এবং স্বভাবচরিত্র সবই বাঘেদের জানা। আর জানা বলেই এই বাঘটিও সকাল বেলার নিশ্চিত আহারের আশায় ঠিক জায়গা মতো এসেই একটা কাঁটা ঝোপের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসেছিল। তার পর শিকার যখন জুটে গেল তখন জেলেদের চেঁচামেচি আর কে পরোয়া করে ? নবাবী মেজাজে আরেকটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ে ব্যাঘ্রাচার্য মহাশয় মহানন্দে প্রাতরাশ সমাধা করে গহন সুন্দরবনে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল তার খোঁজ পাওয়া চারটিখানি কথা! প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে রাজ্যপালের দলবল এসে আধ-খাওয়া মানুষের লাসটাকে উদ্ধার করেছিল বটে, কিন্তু তারাও ঐ বাঘটার আর কোনো হদিসই করতে পারে নি। মাটিতে রক্তের দাগ ধরে

ওপর হঠাৎ এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেই তো খতম! দরকার নেই বাবা, আর আমার বাঘ দেখার সখ নেই।

সে কি মা, গল্প শুনেই এত ভয়! বাঘের চেয়ে মানুষ বড় কম যায় না হিংস্রতায়, এ কথা মনে রাখলে ভয় অনেকটা কেটে যাবে দেখবেন। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, ক্রমে ক্রমে সাহস বেড়ে যাওয়ায় সুন্দরবনের বাঘ ইদানীং আশ-পাশের গ্রামাঞ্চলে গিয়েও হামেশাই হানা দিচ্ছে। মানুষ পেল তো ভাল, আর না পেল তো গোরু-বাছুর নিয়েই দে চম্পট! সেই দুঃসাহসই ধীরে ধীরে এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আজকাল এমন সব ঘটনা ঘটছে যা সহজে বিশ্বাস করাটাই মুস্কিল।

কী রকম, বলুন না তেমন দু-একটা কাহিনীই শোনা যাক।

মনের বাঘ পালিয়েছে তা হলে। নিজেকে কিছুটা সামলে নিতে পেরেছ দেখছি। বহুৎ আচ্ছা! কিঞ্চিৎ খোঁচা দিয়ে আরম্ভ করলেও শেষ পর্যন্ত আচার্য বিনায়ক বাহবাই দেন তাঁর ছাত্রীকে। অঞ্জনার সঙ্গে অমরেশবাবুর আলোচনার গতি তাঁর মনকেও কিছুটা চঞ্চল করে তুলেছিল যে!

ঠিক সেই সময় শিখা পাশ ফিরে শোয়। অঞ্জনা তার পাতলা ঘুমকে নিবিড় করে তোলার চেষ্টা করে আস্তে আস্তে তার পিঠ চাপড়ে। একটু বাদেই অমরেশবাবু আবার তাঁর গল্প বলা আরম্ভ করেন।

এই তো মাত্র কয়েক মাস আগে একটা সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে গেল। রাজ্যপাল দলবল নিয়ে এসেছিলেন সুন্দরবনে বেড়াতে। মাঝনদী থেকে হঠাৎ একটা সোরগোল শোনা গেল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, একজন জেলে মারা পড়েছে বাঘের হাতে।

কী করে মারা পড়ল?—শৈবাল জিজ্ঞেস করে।

অনেকগুলো মাছধরা নৌকো নদীর এদিক-ওদিক রাত থেকে ছড়ানো ছিল। একটিমাত্র জেলে-নৌকো নোঙর করেছিল একটা

খাড়ির মধ্যে। নিয়মমতো কিছু খেয়েদেয়ে মাছধরা শুরু করা হবে সকালবেলা, সব ব্যবস্থাই ঠিকঠাক। সেই ব্যবস্থা মতোই সকালের খাওয়া সেরে নিয়ে নোঙরের দড়ি খুলে আনবার জন্যে খাড়ির একপারে নৌকো থেকে লাফিয়ে পড়ে চব্বিশ-পঁচিশ বছরের একটি জোয়ান ছেলে।

তার পর ?—রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করে অঞ্জনা।

তার পর দড়ি খুলে আনতে গিয়ে যেই সে একটু মাথা উঁচু করেছে আর অমনি কোথা থেকে একটা প্রকাণ্ড বাঘ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর। হাত-পা নাড়বার কিংবা ডাকাডাকি করবার কোনো সুযোগই পায় নি ছেলেটি। আক্রমণকারী বাঘ সঙ্গে সঙ্গেই তার ঘাড় মটকে ফেলেছে আর সঙ্গে সঙ্গেই তার ভবলীলা শেষ !

কী সাংঘাতিক ব্যাপার !—অঞ্জনার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে শুনে। ভয়ে ভয়ে তবু সে জিজ্ঞেস করে, ওর সঙ্গী-সাথীরা কোনো চেষ্টাই করল না ছেলেটাকে বাঁচাবার জন্যে ?

তা করেছিল বৈ কি ! সঙ্গীরা তার বিপদ টের পেয়েই হৈ-হল্লা করে বাঘটাকে তাড়া করার চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু কে কাকে ভ্রূক্ষেপ করে ! সুন্দরবনে যারা আসে তাদের সকলের রীতিনীতি এবং স্বভাবচরিত্র সবই বাঘেদের জানা। আর জানা বলেই এই বাঘটিও সকাল বেলার নিশ্চিত আহারের আশায় ঠিক জায়গা মতো এসেই একটা কাঁটা ঝোপের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসেছিল। তার পর শিকার যখন জুটে গেল তখন জেলেদের চেঁচামেচি আর কে পরোয়া করে ? নবাবী মেজাজে আরেকটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ে ব্যাঘ্রাচার্য মহাশয় মহানন্দে প্রাতরাশ সমাধা করে গহন সুন্দরবনে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল তার খোঁজ পাওয়া চারটিখানি কথা ! প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে রাজ্যপালের দলবল এসে আধ-খাওয়া মানুষের লাসটাকে উদ্ধার করেছিল বটে, কিন্তু তারাও ঐ বাঘটার আর কোনো হদিসই করতে পারে নি। মাটিতে রক্তের দাগ ধরে

ধরে বন্দুক নিয়ে তারা অনেক দূর অবধি এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কোনো ফলই হয় নি তাতে—সব বৃথা !

বাঘ, বাঘ, বাঘ !—হঠাৎ চিৎকার করতে করতে উঠে বসে শিখা।

সেই গোসাবায় এসে পৌঁছানো থেকে বারবার বাঘের কথা শুনে শুনে শিশুমনে একটা প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকবে হয়তো। তাই শিখা এমনি আচমকা চিৎকার করতে করতে উঠে বসেছে। তা ছাড়া তার কানের কাছে বসেই তো প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে অমরেশবাবু অনবরত বাঘের গল্পই করে চলেছেন। ঘুমের মধ্যে সেই সব কথা বাচ্চা মেয়ের কানে গিয়ে থাকবে হয়তো। এ তারও জের হতে পারে। আর নয়তো স্বপ্ন দেখেই জেগে উঠেছে।

ভোরও হয়েছে। সুন্দরবনের নদীতে লঞ্চ বা নৌকোয় বসে সূর্যোদয়ের দৃশ্য দেখতে চমৎকার। ব্রাহ্মমুহূর্তে স্নান সেরে সূর্যদেব যেন নদী থেকেই আকাশ বেয়ে ওপরে উঠছেন। আরেকটু পরে শিখার হয়তো এমনিতেই ঘুম ভাঙত।

কা, কা, কা।

কয়েকটা কাক ডেকে যায়। সুন্দরবনের গহন অরণ্যেও কাক ডাকে। কাকের ডাক নাকি কাজের ডাক। দিনের কাজ শুরু করবার জন্যে পৃথিবীর মানুষকে নাকি ঘুম থেকে ডেকে তোলার দায়িত্ব কাকের। শুধু মানুষকে কেন, পশুপাখিদেরও তারাই জাগিয়ে দেয়। পশুপাখিদেরও যে অনেক কাজ আছে করবার। তাদেরও সংসার আছে, সুখ দুঃখ আছে।

চায়ের হাঙ্গামাটা সেরে নেওয়া যাক এবার।—অমরেশবাবু প্রস্তাব করলেন। পশুপাখিদের নড়াচড়ার সময় হয়ে এসেছে। তার আগেই শিকারের জন্যে তৈরি হতে হবে, এই তাঁর বক্তব্য।

স্টোভে জল গরম হচ্ছিল আগে থেকেই। কেটলিতে টগবগ

করছে জল। অঞ্জনা শাড়ির আঁচল টেনেটুনে গা মোড়ামুড়ি দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। সে চা তৈরি করবে।

আরে, আপনি কেন? আপনি শিখাকে দেখুন। ও বেচারা এক্ষুনি হয়তো উঠে পড়বে। ওকে সামলাতে হবে তো! অংশু আছে, নন্দ আছে, ওরাই চা-টা সব করে দেবে। ওদের আনাইতো হয়েছে এসব কাজে আমাদের সাহায্য করার জন্যে।

না, চা-টা অন্তত আমিই তৈরি করে দিচ্ছি।—অমরেশবাবুর কথার জবাবে বলে অঞ্জনা।

একটা কথা জানেন না বোধ হয় অমরেশবাবু! অঞ্জনা দেবীর ধারণা, ওঁর মতো চা কেউ তৈরি করতে পারে না পৃথিবীতে। অনেক সময় খোলা-খুলি ভাবেই বলে ফেলেন যে, অন্যের হাতের চা খাওয়া ওঁর পোষায় না। অবশ্যি আমার কথাও অনেকটা তাই। সত্যি সত্যি ঐ হাতের চায়ের স্বাদ অন্য কোথাও পাইনে। তবে তার জন্যে এমন কথা বলতে পারিনে যে, অন্য কোথাও অন্য কারুর হাতের চা আমি খাইনে। ঐ হাতখানাতো আর সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র বয়ে বেড়ানো সম্ভব নয়।

যাও, যত বাজে কথার ওস্তাদ!—শৈবালের দিকে আড় চোখে চেয়ে একটু মুচকি হেসে মুখ ঘুরিয়ে নেয় অঞ্জনা এই বলে। তার চোখের তারা দুটি আনন্দ ও অহংকারের ছোঁয়ায় হঠাৎ যেন জ্বলে ওঠে সে হাসির সঙ্গে সঙ্গে।

কেমন যেন একটা মোচড় লাগে আচার্য বিনায়কের বুকের মধ্যে। তাঁর মনে পড়ে যায়, অঞ্জনাই তাঁকে রোজ চা-খাবার তৈরি করে এনে দিত তিনি যখন গান শেখাতেন তাকে।

নদীর প্রায় তীর ঘেঁসে চলেছে মোটর লঞ্চ। রাত ভোরের নরম আলোয় চোখে পড়ে শুধু বন আর বন। তাতে চোখ জুড়োয়।

তীরভূমির খানিকটা জুড়ে কাদামাটি। তার ওপরে কিছু কিছু

ঘাস আর ঝোপঝাড়। তারপরেই সুন্দরী গাছের মহারণ্যের মধ্যে গরাণ আর সুন্দরীর মূল্য বিচারেই এ অরণ্যের নামকরণ হয়েছে সুন্দরবন। কিন্তু তাহলেও এখানকার গরাণ আর হেতেল গাছও খুব উপেক্ষণীয় নয়, কথায় কথায় জানালেন অমরেশবাবু।

এই সাবধান, জলে হাত দিতে যাবেন না এখানে। টুক করে কখন যে হাতখানা কেটে নিয়ে যাবে হাংগরে তা হয়তো টেরও পাবেন না একটু!—চা পরিবেশন শেষ করে জানলা দিয়ে মাথা গলিয়ে নদীতে হাত ধুতে গিয়ে জলের সঙ্গেই আপন মনে একটু খেলছিল অঞ্জনা, হয়তো সে সময় অনেক কিছুই ভাবছিলও। হঠাৎ চমকে উঠে জল থেকে সে হাত তুলে নেয় অমরেশবাবুর সতর্কবাণী শুনে।

এত হাংগর এখানে?

কী বলছেন, কুমীর হাংগরের উৎপাত এখানে সর্বত্র।

ঐ যে সেদিনের সেই ভীষণ ঘটনাটার কথা খুলেই বলো না অমরেশ কাকা!—নন্দ মনে করিয়ে দেয় দিন কয়েক আগের একটা ভয়ংকর দুর্ঘটনার কথা।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। আমাদের গোসাবার হাটে আসবার পথেই সে দিন যে ঘটনাটা ঘটলো তার কথাই বলছিস তো?

হ্যাঁ গো, ঐ যে একটা মেয়ের পা কাটা গেল।—এবার স্পষ্ট করে ধরিয়ে দেয় নন্দ। অমরেশবাবুও ঠিকই ধরেছেন, তিনি সেই কাহিনীই ছোট্ট করে বলে চলেন।

হাটে বিক্রি করার জন্যে কয়েক হাঁড়ি গুড় নিয়ে নৌকো করে ওপার থেকে আসছিল এক ব্যাপারী। সখ করে তার একটা ছেলে এবং একটা মেয়েকেও সে নিয়ে আসছিল সঙ্গে। ঘাটের প্রায় কাছাকাছি আসতেই মেয়েটার কি খেয়াল হলো সে একটা পা ঝুলিয়ে দিলে নদীর জলে। ব্যস, আর কি কথা আছে! হঠাৎ 'বাবা গো' বলে চিৎকার করে ওঠে মেয়েটা। পাটা জল থেকে তুলে দেখে পায়ের অর্ধেকটা তার কখন হাংগরে কচ করে কেটে নিয়ে

গেছে। মেয়েটাকে কোলকাতার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জানি না সে বেচারা এখন কেমন আছে এবং আদৌ বেঁচে আছে কিনা?

ওরে বাবা, কী ভীষণ ব্যাপার!—অমরেশবাবুর মুখে বর্ণনা শুনে চোখ জোড়া ছানাবড়া হয়ে যায় অঞ্জনার।

আচ্ছা, ঐ গাছটার তলায় বাঘের পিঠে ঐ দেবতাটি কে?—চা-পর্ব শেষ করে মনটাকে একটু ঘুরিয়ে নেবার জন্যেই হয়তো বাইরের দিকে একবার তাকিয়েছিলেন বিনায়ক। মনের সঙ্গে একটু আধটু জোর-জবরদস্তিও করতে হচ্ছিল তা নিয়ে। তারই মধ্যে হঠাৎ জঙ্গলে একটা দেবমূর্তি চোখে পড়তেই সেই দেবতার পরিচয় জানতে চাইলেন তিনি অমরেশবাবুর কাছে।

ইনি বাঘেরই দেবতা দক্ষিণ রায়। বাঘের হাত থেকে রেহাই পাবার আশাতেই এ দেবতার পুজো দেয় স্থানীয় লোকেরা। সুন্দরবনের আরেক দেবতা হলেন বনবিবি। সেই দেবীরও খুব প্রভাব এখানকার লোকদের ওপর। খানিক চলতে চলতেই বনবিবির মূর্তিও হয়তো চোখে পড়ে যাবে। দেখতে অনেকটা আমাদের শীতলার মূর্তির মতো। তবে অনেকে আবার মনে করে যে বনবিবির কোনো রূপ নেই। তারা জঙ্গলের মধ্যে জায়গায় জায়গায় মাটির ঢিবি তৈরি করে রাখে। তাদের বিশ্বাস বনবিবি সেখানেই এসে অবস্থান করেন। সুন্দরবনের সকল রকম বিপত্তি থেকে বনবিবি মানুষকে রক্ষা করে থাকে, এ বিশ্বাস কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই সমানভাবে পোষণ করে, এও কম আশ্চর্যের কথা নয়। জেলে কাঠুরে আর যারা মধু নিতে আসে সুন্দরবনে, তারা সবাই দক্ষিণ রায় আর বনবিবিকে স্মরণ করেই তাদের দিনের কাজ আরম্ভ করে।—বিচিত্র এই দুই দেবতার পরিচয় পেয়ে দলের সবাই খুশি। বাঘের হাত থেকে এবং আর সব বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়ও আছে তা হলে!

তা হলে আমাকেও দেখছি দক্ষিণ রায়কে আর বনবিবিকে একটা করে প্রণাম জানিয়েই বন্দুক ধরতে হচ্ছে।—এই বলেই বন্দুকটা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে শৈবাল। এগিয়ে যায় সামনের দিকে। নিজের ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে চুপ থাকতে বলে সবাইকে।

মুখ বুঁজে সবাই গিয়ে শৈবালের পাশে দাঁড়ায়, শুধু অঞ্জনা আর তার মাস্টারমশাই ছাড়া। শিখাকে নিয়ে ব্যস্ত অঞ্জনা। খাওয়ানোর জন্যেই তাকে জাগাতে হয়েছে। অঞ্জনাকেও তাই লঞ্চের ভেতরেই থাকতে হচ্ছে। তা ছাড়া শিকার দেখে শিখার ভয়ও লাগতে পারে। তাই শৈবাল নিজেই তাকে বারণ করে দিয়েছে, শিখাকে নিয়ে সে যেন লঞ্চের ভেতর থেকে বাইরে না আসে।

বিনায়কও বেরোন নি গোলাগুলীর কারবার তাঁর মোটেই ভাল লাগে না বলে। অন্তত সে কথাই তিনি সবাইকে জানিয়েছেন। অঞ্জনা অবশ্য তা বিশ্বাস করে নি। কারণ সে বেশ ভাল করেই বুঝে নিয়েছে এ তার আচার্যের মনের কথা নয়। আচার্যের অন্তরলোকে যে ঝড় শুরু হয়েছে তার প্রচণ্ডতায় অঞ্জনারও যে ভেঙে পড়ার উপক্রম! দশ দিক থেকে বিশ বাহুতে রাবণ জড়িয়ে ধরেছিল সীতাকে। তারও প্রায় সেই অবস্থা। সীতা কী ভাবে আত্মরক্ষা করেছিলেন সীতাই জানেন, কিন্তু সে কী করবে? অঞ্জনা গভীর ভাবে ভাবছিল।

শৈবাল তাক করে। বুকের কাছে তুলে ধরে সে বন্দুকটাকে। কিন্তু শিকার কোথায়? কারুর চোখেই কিছু পড়ে না যে!

মৃত্যুর মতো স্তব্ধ পরিবেশ। মুখ ফুটে টুঁ শব্দটিও করছে না কেউ। শৈবালের লক্ষ্যের দিকে আর সবার দৃষ্টি। কিন্তু বিনায়কের? তাঁর চিন্তা বইছে অন্য খাতে, দৃষ্টিও তাই অন্য দিকে।

গুড়ুম! বন্দুকের মুখে অকস্মাৎ আগুন জ্বলে ওঠে।

শৈবাল ফায়ার করে। কিন্তু গুলী তার লক্ষ্যভ্রষ্ট।

প্রকাণ্ড একটা ডোরাকাটা বাঘ প্রচণ্ড গর্জন করে ছুটে পালিয়ে

যায় একটা কাঁটা ঝোপ থেকে আর একটা কাঁটা ঝোপে। দলের প্রায় সকলেরই বাঘটাকে চোখে পড়ে এক লহমার জন্যে।

গুলী হয়তো লেগেও থাকতে পারে। বাঘটার দৌড়বার ভঙ্গি দেখে সন্দেহ করেন অমরেশবাবু।

ভীষণ উত্তেজনায় সবাই নেমে পড়ে জালিবোট বেয়ে। সকলের হাতেই লাঠিসোটা। অংশুর হাতে একটা সেকেলে বন্দুক। তা হোক, খেলনা বন্দুককেও বাঘ নাকি কিছুটা ভয় পায়।

গুলী ছুঁড়েই একটু দেখে নিয়ে লঞ্চ থেকে জালিবোটে এবং জালিবোট থেকে তীরের মাটিতে সব চেয়ে আগে লাফিয়ে পড়ে শৈবাল। কিন্তু একা তো আর এগুতে দেওয়া যায় না। তাই অমরেশবাবুর ডাকে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছেলে-ছোকরারা সবাই শৈবালকে অনুসরণ করে।

গুলীর শব্দে কী ভয়ঙ্কর ভাবেই না বুকটা কেঁপে উঠেছিল অঞ্জনার। ভয়ত্রস্ত শিখাকে দু হাতে সে চেপে ধরেছিল সেই বুকে। সেই অবস্থায় ভয়েই শিখা চোখ বুজেছিল অনেকক্ষণ ধরে। ভয় কাটলে সে এসে জানালার কাছে দাঁড়িয়েছিল।

যান, আপনিও যান। তা নইলে কী মনে করবেন ওঁরা?—অঞ্জনা বলে তার মাস্টারকে।

কিন্তু কোনো কথাই যেন কানে যায় না বিনায়কের। পুতুলের মতোই নির্বাক আচার্য। চোখ দুটো তার দপ দপ করে জ্বলছে দুটো আগুনের গোলার মতো।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে যায়।

অঞ্জনা!—কামনা-কাতর কণ্ঠে হঠাৎ ডাকেন আচার্য বিনায়ক। দিগ্বিদিক জ্ঞানহারার মতো তক্ষুনি দাঁড়িয়ে উঠে জড়িয়ে ধরতে যান অঞ্জনাকে।

মা, ঐ যে বাঘ, প্রকাণ্ড বাঘ!—ঠিক সেই মুহূর্তেই জানালার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে চিৎকার করে ওঠে শিখা। আচার্যও চমকে

ওঠেন শিখার চিৎকারে। তাঁর উদ্যত হাত দুখানা আপনা থেকেই নেমে এসে নিস্তেজ হয়ে যায়।

বাঘ, কৈ কোথায় !—দু পা পিছিয়ে এসে আচার্য নির্বাক বিস্ময়ে একবার এদিক-ওদিক তাকান।

অঞ্জনা এগিয়ে যায় জানালার কাছে মেয়ের ডাক শুনে।

বাঘ নয়রে বোকা মেয়ে, এগুলো হরিণ।

মা, দেখব !—হরিণগুলো একটু আড়ালে পড়ে গিয়েছিল। সেগুলো দেখবার জন্যে আবদার ধরে শিখা।

মেয়ের সে আবদার রক্ষা করার জন্যেই অঞ্জনা লঞ্চের সামনের দিকে এগিয়ে যায় শিখাকে নিয়ে।

আচার্যও যান তাদের পিছে পিছে।

একেবারে পারে নেমে এসে হরিণ তিনটিকে জল খেতে দেখে ভারি আনন্দ শিখার। মানুষ দেখতে পেয়ে ঝোপের আড়ালে চলে গিয়েছিল ওরা। বেশ খানিকটা ঘুরে এসে অনেকটা দূরে জল খেতে নেমেছে। ভেবেছে আর কেউ ওদের দেখতে পাবে না। মানুষকে ওদের ভীষণ ভয় !

হরিণ কটা মনের আনন্দে জল খাচ্ছে।

জানেন মা, এগুলোকে বলে চিতল হরিণ। তেষ্টা পেয়েছে, বাচ্চাটাকে নিয়ে বাপ-মা এসেছে তেষ্টা মেটাতে।—বুড়ো সারেঙ্গ বুঝিয়ে বলে।

কোনো শিকারীর অব্যর্থ গুলীতে হয়তো একদিন খান খান হয়ে যাবে এই বনহরিণীর সংসার !—অনেকটা যেন নিজের অজ্ঞাতেই হঠাৎ অঞ্জনার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে এই ছোট্ট কথাটি।

কিন্তু আমি তো শিকারী নই, আমি যে সুরকার ! জীবনশিল্পী !—চমক ভাঙে বিনায়কের।

আমাকে লক্ষ্য করেই কি এ কথা বললে অঞ্জনা ?—সন্দেহের দোলা লাগে আচার্যের মনে। দাঁড়িয়ে থাকার মতো পায়ে বুঝি

আর শক্তি পান না তিনি। ধপাস করে বসে পড়েন। তাঁর মনে হতে থাকে শৈবালের গুলীটা যদি তাঁর বুকে এসে লাগত তা হলেই যেন ভাল হতো। এ কি তিনি করতে যাচ্ছিলেন! তিনি না শিল্পী? লজ্জায় যেন মরে যান আচার্য।

মাস্টারমশাই!—অঞ্জনা ছোট্ট গলায় ডাকে তার আচার্যকে। কণ্ঠস্বরে তার গভীর সহানুভূতি।

অঞ্জনা!—আরো নিচু গলায় উত্তর দেন বিনায়ক। কিন্তু আর কোনো কথাই যেন মুখ থেকে বেরোয় না তাঁর। তবু আরো কত কথা তাঁর বলার সাধ। বলতে গিয়ে বারবার তাঁর জিভ আড়ষ্ট হয়ে আসে।

বলুন মাস্টারমশাই, বারবার থেমে যাচ্ছেন কেন?—ছল ছল চোখে অঞ্জনা জিজ্ঞেস করে।

বলব, তুমি শুনবে অঞ্জনা? জান, আমার দীপ্তি আর নেই!

কিন্তু আমিও যে আজ পুরোপুরি আরেকজনের মাস্টার মশাই!—গভীর বেদনা-কাতর কণ্ঠে এ উত্তরটুকু দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অঞ্জনা। সে-ই তো এক দিন মন-প্রাণ উজাড় করে দিতে চেয়েছিল বিনায়ককে। তখন তার জানা ছিল না যে বিনায়ক বিবাহিত। আচার্য তখন তাই কেবলই এড়িয়ে চলতেন তাকে। শেষ পর্যন্ত অঞ্জনা তার চিঠির উত্তরে জানতে পেরেছিল তার আসল কারণ।

দু জোড়া চোখই তখন অশ্রুসজল। শিখা তখনো হরিণ দেখায়ই মত্ত। বাচ্চা হরিণ কেমন লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে তার বাপ-মার সঙ্গে তাই সে গভীর অভিনিবেশে দেখছে।

শৈবাল সদলবলে বন থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে খালি হাতে। মনে মনে সে ধিক্কার দেয় তার ৪৭৫ ম্যাগনাম বন্দুকটাকে।

এর পর সেদিন আর কোনো শিকারই জমে নি। ওরা ব্যর্থ হয়েই ফিরে আসে।

সমাপ্ত